কন্যাকাল

প্রভাত দেবসরকার

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা ১২ ॥

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৬২

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—

শ্রীনরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

স্বপ্না প্রেস লিমিটেড

৮।১, লালবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা—১

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দুই টাকা চার আনা

উৎসর্গ

বাংলা দেশের

সকল অনূঢ়া কন্যাদের

এই লেখকের

অনেকদিন

অকুলকন্যা

দিন-কাল

পরদার

মনোমত

চোখের উপর একটা নিশ্চিত দুর্ঘটনা কেমন ক'রে যেন বেঁচে গেল।

মুহূর্তের বিস্ময়-বিমূঢ় স্তব্ধতা কাটিয়ে আশপাশ থেকে লোকজন হৈ-হৈ ক'রে উঠলো।

মোড়ের ট্রাফিক পুলিশটি হাত নামিয়ে ত্বরিত পায়ে এগিয়ে এসে ভিড়টাকে কেন্দ্রীভূত করলে।

কিছুক্ষণের জন্যে একটা অন্ধ আবেগ উন্মত্ত কৌতূহলে কেবল ভিড়টাকে লক্ষ্য ক'রে আঁকুপাঁকু করে।

সত্যিকারের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

ঘটতে পারতো, কিন্তু ঘটলো না—

দৈব বিশেষ সদয় না হ'লে এমনটা কখনো ঘটে না, হাতের ঢিল ছুঁড়ে কেউ ফিরিয়ে নিতে পারে না।

সাপের মুখ থেকে তবু ফেরা যায়, কিন্তু কোলকাতার উর্ধ্বগামী ট্রামবাসের মুখ থেকে প্রাণ হাতে ক'রে ফেরা নেহাৎ-ই দৈব-খেলা, বিধিলিপি!

ভূমিলুণ্ঠিত চুনট-করা কাঁচি ধুতির কোঁচাটা সামলাতে সামলাতে পাঁচকড়িবাবু ফুটপাথের উপর উঠে এলেন।

এখনো বুঝি তাঁর গা-হাত-পা কাঁপছে। ভয়ে, বিস্ময়ে, আতঙ্কে!

চোখ তুলে পাঁচকড়িবাবু চোখ নামিয়ে নিলেন, লজ্জা পেলেন বেঁচে গিয়ে। সামনে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া থৈ থৈ করছে। চলচ্চিত্রে ধরা ছবির মত।

এরই নাম জীবন, এরই নাম বাঁচা-মরা!

ট্রাম থেকে নামতে যেন একটুকাল বিলম্ব হ'য়েছিল পাঁচকড়িবাবুর, মাটিতে সম্পূর্ণ পায়ের ভর দেবার আগেই পিছন থেকে উড়ন্ত বাসটা এক চুল ব্যবধানে এসেই থেমে গিয়েছিল—ব্রেক-বল্গা কষা যান্ত্রিক অশ্বটা সামান্য কাৎ হ'য়েই নিথর হ'য়ে গেল। বাহাদুরী ছিল চালকের।

খুব বেঁচে গেছেন ! - জোর ফাঁড়া গেল মশাই !

পাঁচকড়িবাবু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে চেয়ে দেখেন।

মুখ ফুটে ঠিক কাকে ধন্যবাদ দেবেন বুঝতে পারেন না।

বেঁচে গেছেন বলে !

উদভ্রান্ত দৃষ্টির পলকে এখনো বুঝি মৃত্যু-বিভীষিকা কাঁপছে, এখনো বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না পাঁচকড়িবাবুর, তিনি সুস্থ শরীরেই জীবিত আছেন।

স্মৃতি বিভ্রমের মত পূর্বাপরে কেমন যেন গোলমাল ঠেকছে। সেই তিনি, সেই সব, জীবনের সেই সূত্র অটুট ! নন্দর কুণ্ডু রোডের জীর্ণ তিনমহলা অট্টালিকার একমাত্র ওয়ারিশ শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র, ওরফে বড়কর্তা।

পঞ্চাশোর্ধ্ব, শান্ত, নিরীহ ভদ্রলোক। চুনট ধুতি, গিলে পাঞ্জাবী, পেটেন্ট-লেদার সব মিলিয়ে কেমন যেন বেমানান বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে, তবু তা বিগত কালের একটা চিহ্নকে অদ্ভুত কৌতুকের সঙ্গে মেলে ধরেছে। দেখার মত নয়, দেখাবার মত বেশবাস ক'রে পাঁচকড়িবাবু বাইরে বেরোন প্রয়োজন হ'লে। প্যারিসের কোন বিখ্যাত এসেন্সের মৃদুমন্দ সুরভি যেন টের পাওয়া যায় পাঁচকড়িবাবুর সান্নিধ্যে।

আবার কোঁচাটা বুঝি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

পাঁচকড়িবাবু সহজ-সুস্থ বোধ করলেন। গন্তব্যের কথা ভাবলেন।

বাধা পড়েছে যখন, তখন ফিরে যাওয়াই উচিত।

সামান্য হাঁচি-টিকটিকিতে আজো এক পা বাড়ান না, এ তো তার চারগুণ— আর একটু হ'লেই হ'য়েছিল আর কি !

দরজা থেকেই ফিরে যাবেন।

পারেন তো ওবেলায় আসবেন নতুন করে যাত্রা করে। বাধা পড়েছে যখন, থাক !

কিন্তু—

রাস্তার এপার ওপার মনে হচ্ছে দুস্তর পারাবার।

যত না মানুষ তার পাঁচগুণ গাড়ি, উচ্ছ্বসিত জলস্রোতের মত বিরামহীন। নিঃশ্বাস ফেলবার সময়ই দেয় না।

পাঁচকড়িবাবুর ভয় হয়। অপেক্ষা করেন, আর একটু, আর একটু—ও ফুটে গিয়ে ট্রামে চড়বেন।

রুদ্ধ-মুখ পয়ঃপ্রণালীর মুখ থেকে কখন আবর্জনা সরে যায়।

পাঁচকড়িবাবু রাস্তা পার হবার জন্যে প্রস্তুত হন, কোঁচাটা সামলে নেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

আবার বাধা।

নিঃশব্দে একটা গাড়ি এসে সামনে দাঁড়ায়। পাঁচকড়িবাবু ত্রস্ত পায়ে ফুটপাথে ওঠবার আগেই শুনতে পান: বড়মামা! বড়মামা?

সম্বোধনকারী গাড়ির দরজা খুলে নেমে আসে।

পাঁচকড়িবাবু বিহ্বল দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন।

ততক্ষণে গাড়ির মালিক পা ছুঁয়ে মাথা তুলতে পাঁচকড়িবাবু বিস্ময়াবিষ্টের মত বললেন, কে? সুকুমার! ভাল আছ? অনেককাল পর—

হাঁ। আপনি ভাল আছেন? সুকুমার পাশে এসে দাঁড়ায়।

পাঁচকড়িবাবু চুপ করে থাকেন। কি জবাব দেবেন যেন ভেবে পান না। ভাল থাকা, না-থাকার প্রশ্নটা এখন কেমন যেন কৌতুকের।

মুখে পরিচয়ের একটা ক্ষীণ আলো দেখা দেয় কেবল।

সুকুমার জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাবেন? চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই।

না, না! পাঁচকড়িবাবু ব্যস্ত বোধ করেন, বাড়ি ফিরবো।

সুকুমার পীড়াপীড়ি করে, ভবানীপুর তো? আমি ঐ দিকেই যাব।

কিন্তু···না থাক। পাঁচকড়িবাবু গাড়ি চড়ার কোনই আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

সুকুমার বললে, আপনাকে পৌঁছে দিতুম—

ম্লান হেসে পাঁচকড়িবাবু বললেন, আমি নিজেই পৌঁছতে পারব। শুধু শুধু কাজের ক্ষতি করবে কেন ?

আমার বিশেষ কোন কাজ নেই।

পাঁচকড়িবাবুর সঙ্কোচের কারণটা যেন সুকুমার বুঝতে পারে।

তা হোক, শুধু শুধু দরকার কি। ট্রামেই বেশ চলে যাব। সুবিধে মত এস একদিন আমাদের বাড়ি।—কোলকাতাতেই আছ তো ?

হাঁ।

সুকুমার আর পীড়াপীড়ি ক'রতে সাহস ক'রলে না।

হঠাৎ-দেখা দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের গাড়িতে উঠে মর্যাদা হারাবার মত আভিজাত্য পাঁচকড়িবাবুর নয়।

পাঁচকড়িবাবুর প্রত্যাখ্যানে নিজের কাছে নিজে ভারি অপ্রস্তুত বোধ করে সুকুমার। তার মনের কোন এক গোপন বাসনাকে পাঁচকড়িবাবু যেন ইচ্ছে ক'রেই প্রকট ক'রে দিয়েছেন—সহজেই বুঝতে পেরেছেন, এত কাল পরে দেখা হতে না হতেই নিজের গাড়িতে ক'রে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার এত আগ্রহ কেন সুকুমারের !

জলে নিশ্চয়ই পাঁচকড়িবাবু পড়েন নি।

মনের কথাটা উভয়েই গোপন রাখে।

আত্মীয়তার সহজ সুরে পাঁচকড়িবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আজকাল কোথায় আছ ? সেই মিলিটারীতেই চাকরি করচো তো ?

ক্ষুব্ধ আত্মাভিমানটা বুঝি সুকুমার চাপতে পারে না, নিরুৎসুক কণ্ঠে বললে, না !

সুকুমারের আপাদমস্তক আর একবার লক্ষ্য ক'রে সাগ্রহে পাঁচকড়িবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ব্যবসা করচো ?

হাঁ।

সুকুমার ঘাড় নাড়লে।

অহেতুক কেমন যেন লজ্জিত, কুণ্ঠিত মনে হ'লো তাকে।

বেশ! বেশ! বুঝি খুশীই হলেন পাঁচকড়িবাবু, একদিন এসো তা হ'লে।

আসব!

গাড়ির দরজা বন্ধ করার সঙ্গে উত্তরটা স্পষ্ট শোনা গেল না, নাকি সুকুমার ইচ্ছে ক'রেই অস্পষ্ট উত্তর দিলে, কথার কথা!

আগ্রহের আন্তরিক স্বর বুঝি বাজে না এতে।

মোড়ের ওপর থেকে সুকুমারের গাড়িটা সরে যেতে কিছুকালের জন্য রাস্তাটা হঠাৎ কেমন যেন ফাঁকা হ'য়ে যায়। দৃষ্টির শূন্যতায় অদ্ভুত মনে হয় পাঁচকড়িবাবুর, এখন শুয়ে বসে রাস্তা পার হওয়া যায়—চাপা পড়বার কোনই ভয় নেই।

সুকুমার!

সব মনে পড়ছে পাঁচকড়িবাবুর।

তাঁর বালবিধবা বোনের হঠাৎ মুছে যাওয়া সম্পর্কে পাড়াগাঁ থেকে একদিন ছেলেটি কলকাতার কলেজে পড়তে এসেছিল। আসা-যাওয়ায়, মেলামেশায় ঘরের ছেলেটির মত সে পাঁচকড়িবাবুর পরিবারের সঙ্গে মিশেছিল। পাঁচকড়িবাবুর স্ত্রী, পাঁচকড়িবাবুর বোন, পাঁচকড়িবাবুর ছেলেমেয়েরা, আত্মীয়স্বজন সবাই বলতো, সুকুমার ঘরের ছেলে। যতদিন কোন পুত্র সন্তান হয়নি পাঁচকড়িবাবুর, যাঁরা জানতেন না তাঁরা বুঝি ভাবতেন, সুকুমার পাঁচকড়ি মিত্রের জ্যেষ্ঠ সন্তান। নিজেরও ছেলেটির সম্বন্ধে পাঁচকড়িবাবুর কেমন একটা মমতা ছিল, গরিবের ছেলে, বেশ ছেলে! চালচলন, কথাবার্তা,

বেশবাস, বেশ অনাড়ম্বর, ভদ্র; একালের ছেলেদের মত নয়। বেশ বিনয়ী, শান্ত।

হঠাৎ রান্নাঘরে একটি অপরিচিত কিশোরকে বসে বোনের সঙ্গে গল্প ক'রতে দেখে পাঁচকড়িবাবু অবাক হয়েছিলেন।

দূর থেকে দাদাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে সিন্ধুবাসিনী ডেকে বলেছিলেন, এ আমার ভাসুর পো, সুকুমার! রসুলপুরের—

সুকুমার ততক্ষণে আসন ছেড়ে উঠে পড়েছে।

মাথা নুইয়ে পাঁচকড়িবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে একপাশে জড়সড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাই-বোনের মুখটা কেমন উজ্জ্বল দেখায়। ছোট হ'লে কি হবে সামাজিক রীতি-নীতিটা জানা আছে ছোকরার—অপরিচিত গুরুজনকে শ্রদ্ধা জানাতে ভোলে না।

পাঁচকড়িবাবু খুশী হয়ে বললেন, বিহারীবাবুর ছেলে! সেই কবে একবার তোমাদের দেশে গিয়েছিলুম মনেই পড়ে না—তুমি বোধ হয় হওনি তখন।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, হবে না কেন! এতটুকু ছেলে তখন সুকু—হাড় জির-জিরে, মাথাটা হেঁড়ে। তুমি দেখে বলেছিলে, কাঁদের ছেলেরে সিধু—কি রোগা! রাত দিন কাঁদতো মনে নেই?

মনে হয়তো আছে, হয়তো নেই।

কোন্ এক অজ পাড়াগাঁয়ের পরের এক রুগ্ন, কাঁদুনে ছেলের কথা পাঁচকড়িবাবু আজো মনে করে বসে আছেন!

পাঁচকড়িবাবু হাসলেন, কৌতুক ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলেন, কাঁদতো নাকি?

সিন্ধুবাসিনী বললেন, কাঁদতো না আর! বলতো, ওঁ মেজো বৌ বিটু দেঁনা! বিস্কুট পেলেও কি তাই ভুলতো ছেলে!

ভারি অপ্রস্তুত বোধ করেছিল সুকুমার সেদিন।

মেজোকাকী যেন কী! এই কি প্রশংসার সময়! তাও এমনি!

পাঁচকড়িবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন, তোমার বাবা দেশেই আছেন? আগে তবু মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হ'তো, আজকাল দেখাই হয় না। কোলকাতায় আসা কি ছেড়ে দিয়েচেন?

সুকুমার মাথা নাড়লে।

আর তেমন দরকার হয় না আসবার। আগে—

কথার মাঝখানে পাঁচকড়িবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবার সে-কারবার আছে? ধান-চাল কি যেন করতেন?

সুকুমার চুপ করে রইল।

কারবার নষ্ট হওয়ায় বাপের চেয়ে ঘরে-বাইরে তারই লজ্জাটা যেন বেশি।

একটা ভুলে যাওয়া সুখের দিনকে হঠাৎ মনে করে, দুঃখ পাওয়া, বেদনা বোধ করা, লজ্জা পাওয়া!

লক্ষ্য ক'রে সিন্ধুবাসিনী বললেন, সে কবে গেচে। ছবির বিয়ের পরেই, ও তখন আর কত বড়। কী কারবার ছিল!

তাই বিহারীবাবুকে আর এদিকে দেখতে পাওয়া যায় না। চেতলার দত্তদের গোলায় তখন প্রায়ই দেখা হতো।

এখন কি করচেন? পাচকড়িবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সুকুমার উত্তর দিতে পারে না।

উত্তর দেওয়াটা যেন বড় লজ্জার ব্যাপার।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, কি আর করবেন, জমিদারী দেখচেন। কমতো ছিল না! তাও তো শুনছি কি সব হয়ে গেচে—

সুকুমার কাকীর মুখের দিকে কেমন যেন ব্যথিত দৃষ্টিতে চাইলে।

কি দরকার সে-সব কথার আর!

উনি নাই বা জানলেন।

কেন, কি হয়েছে?

স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মত পাঁচকড়িবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

না, কিছু হয়নি।

গলার স্বরটা সুকুমারের কেমন বিকৃত, উত্তেজিত শোনায় যেন।

সেদিন বুঝি এমনি কথার কথা বলেছিলেন পাঁচকড়িবাবু কুটুমের ছেলের সাক্ষাতে—তোমরা তো জমিদার!

কিন্তু তারপর কতদিন ঘনিষ্ঠ হবার পর সুকুমারের মনে হয়েছিল পাঁচকড়িমামা তাদের অবস্থাকে ঠাট্টা করেছিলেন—করুণার চক্ষেই তাদের দেখতেন।

পাঁচকড়িবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি সব পার্টিসন হচ্ছিল, হয়ে গেছে?

সুকুমার মাথা নাড়লে, না।

সে কি! এখনো—

পাঁচকড়িবাবু যেন আঁৎকে ওঠেন।

তোর বিয়ের পরের বছরেই যেন আরম্ভ হয়েছিল, নারে সিন্ধু?

অত কি মনে আছে, সে কোন্ যুগ আগে—বিয়ের কনে অত কি বুঝি! সিন্ধুবাসিনী পুরানো স্মৃতির পুনরুত্থান করতে চান না।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, আমার কিন্তু বেশ মনে আছে, বিনোদ তখন প্রায়ই কোলকাতায় আসতো—বলতো বিষয় নিয়ে মামলা-মকদ্দমা চলচে। বাবাও যেন কি সব পরামর্শ দিতেন। বিষয়-বিষয় ক'রে ছোকরা খুব ছোটাছুটি করতো। তালপুকুর বললে বিনোদ কি রাগানটাই না রাগতো!

পুরানো কথা মনে ক'রে পাঁচকড়িবাবু মনে মনে কৌতুক বোধ করেন।

হঠাৎ কি মনে হয় সিন্ধুবাসিনীর। দাদার কথায় প্রতিবাদ করে ওঠেন, ও কথা বললে চলবে না, সত্যিই ওঁরা জমিদার। দেখে এসেছো তো—

কী বাড়ি-ঘর, কী ঠাকুরদালান, লোকজন, পূজোপার্বন! বাড়ির সামনে পুকুরটা কত বড় বল দিকি! পদ্মপুকুরের চেয়েও বড়।

তালপুকুর!

পাঁচকড়িবাবু হাসেন।

সে পুকুরটা আছে?

নেই তো যাবে কোথায়!

সুকুমার বুঝতে পারে না প্রশ্নটার মানে কি। পুকুর আবার যাবে কোথায়!

সুকুমার চুপ করে থাকে।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, পুকুরটা আমাদের আছে তো?

মুখ নীচু ক'রে সুকুমার বললে, না, রায় সাহেবের ভাগে পড়েছে।

অমন পুকুরটাও গেচে!

অনেককাল সিন্ধুবাসিনী শ্বশুরবাড়ির আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন, আবার যেন তাঁকে নতুন করে আশা ছাড়তে হলো। কণ্ঠস্বরটা বিশেষ ক্ষুব্ধ, ব্যথিত মনে হলো।

অপরাধটা যেন সুকুমারের, ধিক্কারে কুণ্ঠায় সে কাঁটা হয়ে রইল।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, সেই পার্টিশান এখনো চলচে? বিশ বছরের ওপর হয়ে গেল!

কোন আশাই কোনদিন করেননি সিন্ধুবাসিনী শ্বশুরবাড়ির বিষয় সম্পর্কে। তবু যেন কত নিরাশ হয়েছেন তিনি: আর চলে কাজ নেই!

প্রসঙ্গটা ক্রমেই যেন অপ্রিয় হ'য়ে ওঠে।

কেন যে সুকুমার বিস্মৃতপ্রায় সম্বন্ধের ছিন্ন সূত্রটাকে জোড়া দিতে এসেছিল!

জ্ঞান হ'য়ে মেজকাকীর সঙ্গে এই তার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়।

মেজকাকী অবশ্য ভাসুরপোকে আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি করেননি—

সংবাদ পেয়েই দোরগোড়ায় এগিয়ে এসেছিলেন, সুকুমারের নুয়ে-পড়া মাথাটা সস্নেহে তুলে ধ'রে চিবুক স্পর্শ ক'রে চুমু খেয়েছিলেন, হাত ধ'রে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে সামনে বসিয়ে কত কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। যেন কত জানাশোনা, কত সাক্ষাৎ-পরিচয় আছে তাঁর রসুলপুরের সবার সঙ্গে!

সুকুমার মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল—মাতৃরূপের আর এক প্রকাশ এই মেজকাকী!

নিজের মাকে সুকুমার জানে, আর কাকীমাদেরও জানে, কিন্তু মেজকাকীমাকে জানলে এই প্রথম—এ জানার কী যে আনন্দ বোঝা যায় না।

হঠাৎ মাঝখান থেকে বিষয়ের কথাটা উঠতেই মেজকাকীমা কেমন যেন হয়ে গেলেন। কিছু না বললেও মাঝে মাঝে যা বলছেন তাতেই তাঁর মনের বিরক্তিটা স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। নিজের স্বার্থ নষ্ট হওয়ায় তিনি যেন বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে মনে। অথচ সুকুমার জানে না ঘটি-না-ডোবা তালপুকুরে তাঁর কতটুকু অংশ আজো আছে!

মেজকাকার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তো শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছেন। বড়লোকের মেয়ে ছিলেন, তাই বিধবা হয়ে স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার তাঁর প্রয়োজন হয়নি। সামান্য ভাত-কাপড়ের জন্যে জীবনভোর ঐ অজ পাঁড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতে বয়ে গেছে! কি দরকার তার।

বাড়ির কাজে-কর্মে মেজকাকীমাকে নিয়ে আসবার কথা উঠলে মা-ই আপত্তি করতেন, না, না, থাক, এখানে কোথায় আসবে? না ঘাট-পথ, না কিছু, ওরা কোলকাতা শহরের মেয়ে, এখানে পোষাবে না···যেখানে আছে সুখে

থাক! এতদিন যখন খোঁজ নেওয়া হয়নি তখন আর নাই বা আদিখ্যেতা ক'রলে। আর এলে কি এমন হাত-পা বেরবে।

বড়পিসি ছিলেন মুখ-খরো।

তিনি মার কথায় সায় দেননি। বলেছিলেন, শ্বশুর ঘরে কাজের বাড়িতে আসবে তার আবার হাত-পা বেরন কি। মেয়েমানুষের এর চেয়ে বড় কি আর আছে? জন্মজন্মান্তরে স্বামীর ঘর শ্বশুর ঘরই তারা কামনা করে। শহুরে বড়লোকের মেয়ে বলে তার জন্যে হিন্দু শাস্ত্রে আলাদা ব্যবস্থা হ'বে না! বললেই হলো আসবে না—

মা আর কিছু বলেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেজকাকীমাও আসেন নি।

কেন জানি না সেদিন অচেনা অদেখা মেজকাকীমার ওপর সুকুমারের রাগ হয়েছিল—সত্যি এলে তাঁর কি এমন অসুবিধা হতো! মেয়ে বলেই সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছেন!

তবু মনে মনে কেমন যেন একটা শ্রদ্ধা ছিল সুকুমারের মেজকাকীমার অনুপস্থিত অস্তিত্বের জন্যে। সবার থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র এই মেজকাকীমা, অদেখায় কেমন যেন মহিমান্বিতা!

তিনি যদি দয়া ক'রে হঠাৎ একদিন এসে পড়েন পুজোর সময়, কি রাসের সময়, কি দোলের দিন, না তো পয়লা বৈশাখে গোষ্ঠে!

মেজকাকা আর কোনদিন ফিরে আসবেন না, কিন্তু মেজকাকী তাই বলে যে একেবারে পর হয়ে যাবেন এ বিশ্বাস সুকুমার কোনদিন করেনি। একদিন তাঁকে আসতেই হবে, প্রয়োজনে নয়, সংস্কারে।

হিন্দু নারীর চিরবাঞ্ছিত আশ্রয় যে এই স্বামীর ঘর, নিদারুণ মৃত্যু-শোকে, পীড়নে, নির্যাতনেও এর ক্ষয় নেই, একে মুছে ফেলা যায় না—

বড় পিসিমা একদিন বলেছিলেন জোর দিয়ে।

আরো বলেছিলেন পিসিমা সেদিন মাকে, বড় বৌ, ও কিছু না, গরিব, বড়লোক ব'লে কোন কথাই নেই। হিন্দুর ঘরের বিধবা, শ্বশুর ঘর ছাড়া আর

গতি নেই। যেখানেই থাক, এইখানেই চিরকালের সম্পর্ক। মাথার সিঁদুর মুছে ফেললেও একে মুছে ফেলা অত সহজ নয়···তোমাদের ভয়ের কোন মানেই আমি বুঝতে পারি না বড় বৌ। কি যে তোমরা ভাব, বড়লোকের মেয়ে! বড়লোকের মেয়ে! কেন আমার বাপ-ভাইরা কি কম বড় লোক?

হয়তো ভয়ই।

বড় লোকের মেয়ে, তায় কোলকাতায় মানুষ—পাড়াগাঁয়ে এলে অসুবিধা হবে, কষ্ট হবে। কাজ কি! বাপের বাড়িতে আছে, বেশ আছে।

সুকুমারের মা-ই বুঝি এই আপত্তির মূলে ছিলেন।

তিনি কি বুঝেছিলেন কে জানে!

মাঝে মাঝে ঐ কথাই উঠতো, মেজকাকীমা কোনদিন রসুলপুরে আসেন নি। উৎসবে, কি কাজ-কর্মে যখন মেজকাকীকে আনার কথা হতো সুকুমার অকারণে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। খেলতে খেলতে কতদিন সদর রাস্তাটার দিকে চেয়ে খেলার সাথীদের বলতো, আমার 'কাইমা' আসবে গো!

তারপর উৎসবের দিন ঠিকই এসে যেত, কাজকর্মও চুকে যেত, কিন্তু সুকুমারের মেজকাকীমা আসতেন না।

সে কী অভিমান সুকুমারের!

মেজকাকীমার না আসার সঠিক কারণ সে জানতো না।

মাকে জিজ্ঞেস করলে ধমক খাবে, আর কাউকে বললে লজ্জায় পড়বে।

বড়লোকের মেয়ে পাড়াগায়ে বাস করতে আসবেন কেন?

একদিনের কথা সুকুমারের আজও স্পষ্ট মনে আছে—

ক্লাশ ফাইভে পড়ে সে। ছোটকাকার সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল। সার্কেস, বায়েস্কোপ, গড়ের মাঠ, চিঁড়িয়াখানা, মরা-সোসাইটি, হাওড়ার পোল দেখা হ'য়ে গেছে। দেশে ফেরবার আগের দিন ছোটকাকা তাকে যেন এখানে এনেছিলেন। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, ঠিক মনে পড়ছে না কোন্ ঘরে কোথায় এসে তারা বসেছিল। যিনি তাদের অভ্যর্থনা

ক'রে বসিয়েছিলেন তাঁর মুখটাও মনে পড়ছে না। তবে তাকে যে এক সময় ঠেলে বাড়ির ভেতর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুকুমারের স্পষ্ট মনে আছে। দরজার আড়ালে এতক্ষণ একটা কোমল হাত যেন তাকে উদ্দেশ্য করে ওৎপেতে ছিল। সে হাতের মধ্যে গিয়ে সুকুমার যেন কি হ'য়ে গেল, কিছু তার মনে নেই। যখন আবার সে বাইরের ঘরে ফিরে এল তার অবস্থা দেখে উপস্থিত সবাই বুঝি খুব কৌতুক বোধ করেছিলেন। কী বোকা, লাজুক ছেলে!

সেই কোমল হাতের স্পর্শ যেন তখনো তার সারা দেহে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল—কেমন হতভম্ব, ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল সে। সেই থেকে মুখ তুলে চাইতে পারেনি সে। এত লজ্জা, এত জড়তা কেন যে, কোথা থেকে এসেছিল সুকুমার আজো বুঝতে পারে না। অথচ তিনি যে—

দেশে ফিরে ছোটকাকা মার কাছে গল্প করেছিলেন।

সুকুর কাণ্ডটা যদি তুমি দেখতে!…মেজোবৌদি এসে হাত ধরতে ছেলে একেবারে যার নাম লজ্জাবতী লতা—মুখ আর তোলেই না। ওঁরা কত নিন্দে করলেন, ছেলে তোমার গেঁইয়া হ'য়ে গেছে। পাড়াগেঁয়ে ভূত কোথাকার!

মা শুনে তাকে কিছু বলেননি।

ছেলের ব্যবহারে মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শেষটা ছোটকাকাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিলেন, তোমরাই দেখ, আমি কি বলবো। ঐ সব ছেলেকে কোথাও নিয়ে যেতে আছে, না, লোকালয়ে বার করাবার মত!

মেজকাকীর সঙ্গে এই ব্যবহারের জন্যে নিজেকে সুকুমার মনে মনে দোষারোপ করেছিল—কেন সেদিন অমন বিপরীত কাণ্ড করলে সে, কেন মেজকাকীর সাগ্রহ বাহু-বন্ধনে নিজেকে ধরা দিতে তার অত সঙ্কোচ বোধ হ'লো, ভাল ক'রে মুখ তুলে কেন দেখতে পারলে না? অথচ এই

মেজকাকীকেই সে দেখবার প্রার্থনা করেছে শয়নে-স্বপনে-জাগরণে! তার ছোট মনে সঙ্গোপনে কি মূর্তি সে কল্পনা ক'রে রেখেছিল।

আজকের প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে হয়তো তার মিল ছিল—এই কাছে বসিয়ে নিতান্ত নিবিড় পরিচয়ের মধ্যে কোথায় .যেন সে-স্বপ্ন স্বার্থক ছিল। মেজকাকীমা কেবল সুন্দরই নন, কী মধুর, কী স্নিগ্ধ তাঁর কথাবার্তা! সবার থেকে ভিন্ন আবার সবায় চেয়ে প্রেয়; দৃষ্টি থেকে কতদূর কিন্তু মনের মাঝে কত নিকট, কত আপনার!

মেজকাকীমা 'আয়' ব'লে ডাকতে সুকুমার আনন্দ-বিহ্বল অদ্ভুত এক শিহরণ বোধ করেছিল।

কত না দ্বিধা-সংশয় ছিল তার মনে মনে। মেজকাকী যদি না তাকে চিনতে পারেন, বাড়িতে যদি ঢুকতে না দেন!

তার চেয়ে বোধ হয় মেজকাকীই বেশী খুশী হয়েছিলেন তার অপ্রত্যাশিত আগমনে। যেন মেজকাকীই অপেক্ষা করছিলেন তার জন্যে।

অত বড় ছেলের গায়ে-মাথায় সে কী হাত বুলোন, সে কী আদর আপ্যায়ন! বড় অপ্রস্তুত বোধ করেছিল সুকুমার, এত সে আশা করেনি।

এসেছে সে কখন, মেজকাকীই ছাড়েননি। ব'স্ না ব'স্ না ক'রে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেল। রাত বুঝি শেষ হয়ে যায়!

তাকে সামনে বসিয়েই মেজকাকীমা কত কাজ করতে লাগলেন।

এক এক করে পাঁচকড়িমামার তিন মেয়ের চুল বেঁধে দিলেন, আর দু'মেয়ের বো ক'রলেন, পাঁচকড়িমামার স্ত্রীর চুল বাঁধলেন পরিপাটি করে। অদ্ভুত নিয়মানু-বর্তীতায় তারা এক এক করে এসে মেজকাকীমার সামনে বসল, এক এক করে আবার প্রসাধন শেষ হতে উঠে গেল। সামনে একজন অচেনা লোক

বসে আছে তারা খেয়ালই করলো না—একবার চেয়েও দেখলে না, মানুষটা কে!

সুকুমার কুণ্ঠা বোধ ক'রলেও তার সামনে তারা এতটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করলে না। হয়তো লজ্জার কিছু নেই এতে—পিসিমার ভাসুর পো তার সামনে আবার কুণ্ঠা কি, তাকে আবার লজ্জা কি! তা ছাড়া কলকাতার মেয়েরা অমন পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের মত জড়সড় নয়, থতমত খাওয়া নয়।

কেশ প্রসাধন ব্যাপারে মেয়েরা যেমন, পাঁচকড়িমামার স্ত্রীও মেজকাকীমার মুখাপেক্ষী। তিনিও ছোট্ট মেয়েটির মত মেজকাকীর সামনে এসে বসলেন। কাঁটা-ফিতে-দড়ি নিয়ে চুপটি ক'রে অপেক্ষা করলেন। খুব বড় একটা মোমের পুতুলের মত তাঁকে দেখতে লাগে। স্বাস্থ্য, শ্রী, বর্ণ সব কিছুর আধিক্যে কেমন যেন অদ্ভুত সুন্দরী! ঠিক অতখানি দেহ না থাকলে কে বলবে, অতগুলি মেয়ে তাঁরই। মুখটা কচি কিশোরীর মত।

তিনিও একটি প্রশ্ন করলেন না সুকুমারের সম্বন্ধে। মেয়েদের মত ননদের সম্পর্কে ছেলেটিকে মেনে নিয়েছেন। এত কথার মাঝে একটি কথাও তার জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছে হ'লো না। কড়ির পুতুল-পুতুল মুখে পাথর-পাথর চোখ দুটো স্থির পলকহীন। কে গো কে!

মেজকাকীর মত ওরাও যদি আলাপ করতো!

মনে মনে কোথায় যেন ক্ষোভের মেঘ ঘনিয়ে ওঠে সুকুমারের। বড়লোক বলে কি ওরা তাকে গ্রাহ্য ক'রছে না, আমল দিচ্ছে না? না, মেজকাকীর লোক বলে, নতুন বলে, সঙ্কোচ বোধ করছে?

তা ছাড়া জানা নেই, শোনা নেই, কি কথা কইবে, কি আলাপ ক'রবে!

বাধ-বাধ ঠেকলেও কেমন যেন ভাল লাগছিল সুকুমারের নফরকুণ্ডু রোডের বড়লোকের বাড়ির অন্দর মহলের এই জীবনযাত্রা।

তাদের রসুলপুরের বাড়ির সঙ্গে এর কোন যোগ নেই—মা-কাকী-বোনেরা কোথায় কি ভাবে যে প্রসাধন কার্য সমাপন করেন লোক-চক্ষুর অন্তরালে টেরই পাওয়া যায় না। এমন গোছ-গাছ, পরিপাটি ব্যবস্থাও নয় সেখানে। খাওয়া-পরা-শোয়ার মধ্যে কেমন একটা হেলা-ফেলা ভাব। মনেই পড়ে না সুকুমারের ঐ পাঁচকড়িমামার স্ত্রীর মত তার মা কোনদিন দিনের শেষে আনুষঙ্গিক প্রসাধন সমাপনান্তে গাত্রমার্জনা করেছেন কি না। সকালে মাকে যে বেশে দেখা যায়, সন্ধ্যেতেও তাকে সেই বেশে দেখা যায়—কচিৎ কখনো যদি তিনি বেশ পরিবর্তন করেন, অর্ধেক দিন তিনি কেশচর্চাই করেন না। কতদিন ঘুমের মাঝখানে জেগে উঠে সুকুমার সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে, মা যেন লুকিয়ে লুকিয়ে ধরা পড়বার ভয়ে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে কোন রকমে চুল-বাঁধাটা সেরে নিচ্ছেন।

পাঁচকড়িমামার স্ত্রীর সঙ্গে মায়ের বয়েসের তফাৎ আর কতখানি ?

ঐ তো তাঁর বড় মেয়ে, মায়ের মতই মাথায়। সুকুমারের চেয়ে আর কত ছোট হ'বে ? বড় জোর দু'এক বছর।

কিন্তু মনে হয় তার মা যেন কত বুড়ো হ'য়ে গেছেন, সব সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়েছেন, আর কিছুর তাঁর দরকার নেই। ভূতের মত কেবল খাটতে পারলেই খুশী !

মেজকাকীমা যদি তাদের সংসারে বাস ক'রতেন তা হ'লে মার কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য হ'তো। মা কেবল খাটতেই জানেন !

পাঁচকড়িবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন, সেই পার্টিশান এখনো মেটেনি?

কাচুমাচু সুকুমার বললে, না।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, সহজে মিটবে! সর্বস্বান্ত হোক আগে—

ভাইএর চেয়ে বোনই যেন বেশি বোঝেন বিষয়কর্ম।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, তোমার মনে নেই, একবার কলকাতা থেকে আমরা তোমাদের সামনের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলুম—এই এত মাছ, ততো মাছ, লোকের মুখে কী গল্প! এদিকে সারাদিন রোদে পুড়ে একটা আঁশ পর্যন্ত উঠলো না। শেষে আসবার সময় তোমার ন-কাকা কি করলেন জান, একটা সালতি ক'রে পুকুরের মাঝখানে গিয়ে জাল ফেললেন—ইয়া বড়-বড় দুই কাৎলা উঠলো, এক একটা দশ সের! তোমার ন'কাকা আচ্ছা মেছো! আমরা আর সারাদিনে কি করলুম।

সিন্ধুবাসিনী উৎসাহিত হ'য়ে বললেন, কর্তারা ঐটে খুব করে গেচেন—দুধ আর মাছ, কে কত খাবে খাও! গড়টাতেও কি মাছ কম! বিয়ের কনে গেছি, আমার কাজই ছিল মাছ কোটা। নড়তে চড়তে ন'ঠাকুরপো ছোট্‌ঠাকুরপো মাছ ধরে আনছে। তাই কি অত বড় বড় মাছ আমি কুটতে পারি কখনো—হাত কাটবো কি, মাছ কাটবো ভেবে পাই না।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, সেবারে হঠাৎ বিনোদ একটা মাছ পাঠিয়েছিল পঁইত্রিশ না সাঁইত্রিশ সের, লাল টক্‌টক্ করচে, রুই মাছ, পাকা। বাবা তক্ষুনি সে-মাছ একটা ঝাঁকা মুটের মাথায় করে নরেশ বাবুর বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন—আমরা কত বললুম, বাবা শুনলেন না—বললেন, পাঁচজনে দেখুক, খেলেই তো ফুরিয়ে যাবে।

সিন্ধুবাসিনী জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, এখনো সে রকম মাছ আছে পুকুরে?

সুকুমার কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন, থাকবে কি করে? ভাগের মা গঙ্গা পায় না—কে বা দেখচে, কে বা ক'রচে!—একটার দরকার হ'লে পাঁচটা মারচে বোধ হয়।

সুকুমার অবাক হয়।

আশ্চর্য মেজকাকীমার বিষয়-বুদ্ধি!

এতদূর থেকে উনি দৃষ্টি রেখেছেন, সব দেখতে পান, বুঝতে পারেন।

সত্যিই পুকুরে আর মাছ নেই, রেষারেষি ক'রে সব উঠে গেছে। এখনো যা-ও আছে জাল ছেঁড়া, পোলো ভাঙ্গা।

কেন জানি না সুকুমার মিথ্যে বললে, আছে।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, অত মাছ, থাকবে না তো কি! সিন্ধু তোর যেমন কথা—

বোধ হয় মেজকাকীমা একটু অপ্রস্তুত বোধ করেন।

শ্বশুরবাড়ির সম্পদকে তাঁর এমনি করে দেখা উচিত হয়নি।—

বাঙালী হিন্দু ঘরের মেয়েদের শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্যের শেষ আছে নাকি, না, তার ক্ষয় আছে?

সিন্ধুবাসিনী বললেন, থাকলেই ভাল। দেখতে ভাল, শুনতে ভাল, লোককে বলতেও ভাল।

অথচ এমন ভাবে কথাগুলো মেজকাকীমা বললেন যেন স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির সব ঐশ্বর্য উড়ে-পুড়ে, হেজে-মজে যাওয়াই উচিত ছিল। এখনো কিছু থেকে থাকার জন্যে মনে যেটুকু দুঃখ তিনি পাচ্ছেন, তখন আর কিছু পেতেন না—সহানুভূতি প্রকাশের মধ্যে অশেষ আনন্দ পেতেন।

হঠাৎ মেজকাকীমাকে কেমন দেখতে লাগে যেন সুকুমারের। আবার পর-পর।

পাঁচকড়িবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কলেজে ভর্তি হয়েছো? কোন্ কলেজ?

সুকুমার বিনীত কণ্ঠে বললে, আশুতোষ।

বেশ। শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে নরেশ জ্যাঠার সেজ ছেলে একসঙ্গে পড়তো। পাঁচকড়িবাবু বললেন।

খুব যেন একটা ভরসার জায়গায় এসে পড়েছে সুকুমার।

অতঃপর পড়াশোনার তার কোন অসুবিধা হবে না।

শেষ পর্যন্ত পাঁচকড়িমামা আছেন। শ্যামাপ্রসাদ এঁদের চেনা-জানা!

আরো আলাপ করলেন পাঁচকড়িবাবু, প্রিন্সিপ্যাল কে এখন?

পঞ্চানন সিংহ। উৎসুক কণ্ঠে সুকুমার বললে।

খুব চিনি! কে জানিস সিন্ধু, মার মামাকে দেখেছিস কোনদিন? মনে পড়ে না? তাঁর সম্পর্কে নাতজামাই হন। ভদ্দর লোকের বাড়ি সিরামপুর তো?

হাঁ।

মনে মনে কোথায় যেন সুকুমার উল্লসিত বোধ করে।

কত সব বড় বড় লোকের সঙ্গে এঁদের ভাব-সাব, জানাশোনা, আত্মীয়তা!

ভাগ্যে জোর ক'রে কলকাতায় পড়তে এসেছিল সুকুমার!

দয়াপরবশ হ'য়ে পাঁচকড়িবাবু অনেক সাহায্য করেছিলেন সুকুমারকে। টুইশনি, বইপত্র অনেক যোগাড় করে দিয়েছিলেন।

তাঁর চোখের ওপর সুকুমার বি-এ পাশ করেছে। কোন্ এক মামার বাসায় থাকতো ছোকরা—ছেলে পড়াতো, নিজে পড়তো—খুব কষ্টসহিষ্ণু ছিল ছোকরা! একরকম তাঁর বাড়িতেই সারা দিন কাটাতো। কাকী-ভাসুরপোয় রাতদিন কী যে গল্প হতো, কে জানে। যখনই দেখ, সুকুমার কাকীর সামনে মুখোমুখি হ'য়ে বসে আছে, নয় পিছনে আছেই।

একটা সুবিধা ছিল, ছেলেটি খুব অনুগত আর বিনয়ী। পরোক্ষভাবে এইটিই ছিল পাঁচকড়িবাবুর লাভ।—সিন্ধুবাসিনী ওকে দিয়ে সংসারের অনেক প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ ক'রে নিতেন। মেয়েগুলো সুকু'দা বলতে পাগল!

হঠাৎ পাঁচকড়িবাবু কেমন বিমনা হয়ে পড়েন।

কি যেন তাঁর মনে পড়ে। অনেকগুলি মেয়ে তাঁর। মীরাকে নিয়ে পাঁচটির এখনো বিয়ে দিতে বাকি—একটির বিয়ে দিয়েই তিনি কাহিল হয়ে পড়েছেন। তাও সেই কবে বিয়ে হয়ে গেছে, একযুগ আগে। পর পর সব দাঁড়িয়ে গেছে, এত সন্ধান করেও উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। বর পছন্দ হয় তো, ঘর পছন্দ হয় না—ঘর পছন্দ হয় তো, বর পছন্দ হয় না। তার ওপর আজকালকার ছেলেদের মেজাজ! নিজেরাই দেখে-শুনে মেয়ে ঠিক ক'রছে। বাপঠাকুর্দাকে গ্রাহ্যই করে না, কথাও রাখে না।

কি দিনকাল পড়লো!

কথার কোন মূল্য নেই, মর্যাদা নেই বংশ, কুলের।

সুধার বিয়েটা যা হোক হয়ে গিয়েছিল, রক্ষে!

এক কথায় রাজী হ'য়ে গিয়েছিলেন সুধার শ্বশুর। মেয়ের রঙ-এর কথা উঠেছিল, কিন্তু ভদ্রলোক সে সম্বন্ধে কাউকে কোন উচ্চবাচ্য করতে দেননি: ঘরের বৌ যাঁকে করচি তাঁর আবার রঙ-এর বিচার! আসল হলো বংশ! যে-সে বংশ নয় ভবানীপুরের মিত্তিররা! কোম্পানির আমলের বনেদী ওঁরা!

সুধার শ্বশুরের পর অমন কথা আর কেউ বলে না।

সুধার চেয়ে আরগুলো উজ্জ্বল হলে কি হবে, বরপক্ষ দেখতেই পায় না। এমন ভাবে সব কথাবার্তা চালায়, মনে হয় বিয়ে শেষ হলেই ছাঁদনায় লাথি মারবে—কেবল পাওনা গণ্ডার হিসেব! সম্পর্ক শুধু মেয়ের বাপের টাকা-পয়সার সঙ্গে।

মীরা, রেখা, রেবা, শান্তা, শিপ্রা!

গলায় গলায় হয়ে আছে—মাছের কাঁটার মত—মনে পড়লেই খচ্‌খচ্‌ করে।

এত বড় একটা যুদ্ধ গেল, কত উলোটপালোট হয়ে গেল, কিন্তু সুধার পর আর একটি মেয়েকেও তিনি পাত্রস্থ করতে পারেননি।

যেন যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচকড়িবাবুরা সমাজে অচল হয়ে গেছেন।

বাইরে থেকে নফরকুণ্ডু রোডের তিনমহলা বড় বাড়িটার দিকে বুঝি কেউ আর ফিরেও তাকায় না। বড় বাড়ির বড় নাম কেমন ক'রে যেন রাতারাতি ছোট হয়ে গেছে।

অজান্তে গৌরব নষ্ট হয়েছে।

সেই দুর্ভিক্ষের বছর থেকেই যেন লোকচক্ষুর বিস্ময়টা আর কোথাও, আর কিছুতে নিবিষ্ট হয়ে গেছে।

নফরকুণ্ডু রোডে নব নব বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে—কত নতুন ধরনের বাড়ি-ঘর উঠেছে, নতুন মানুষ-জন এসেছে, নতুন চাল-চলন শুরু হয়েছে।

অত যে নারকেল গাছ ছিল পাড়ার এখানে-ওখানে, নতুন বাবুদের হুকুমে সব কেটে সাফ হয়ে গেছে। কিন্তু একটা এখনো আছে মরা-জরা হয়ে বড় বাড়ির অন্দর মহলের ঠিক মাঝ মধ্যিখানে। হেলে বেঁকে ত্রিভঙ্গ হয়ে কিম্ভূত মূর্তি! সংস্কার, শাস্ত্র এখনো মানেন বলে পাঁচকড়িবাবু গাছটাকে বুকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছেন। ভক্তিতে গোড়ায় জল ঢালেন না বটে, কিন্তু ভয়ে ঘাও দেননি কোনদিন সেটাকে। এই সেদিনও গাছটার মাথায় শকুন বসে অন্দরমহলের উঠানটা নোংরা ক'রে দিয়ে গেছে। একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় বাড়িতে মোটামুটি রকমের স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। মরে-মরেও নারকেল গাছটা বেঁচে আছে। অনেক অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয় সেটার জন্যে বাড়িশুদ্ধ সবাইকে, তবু কিছু করাও যায় না। অনেক ভেবে-চিন্তে, পরামর্শ করে সেদিন সবে শকুন-চিলের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে পাঁচকড়িবাবু গাছটার মাথায় একটা ভেজিটেবল অয়েলের টিন বাঁধিয়ে দিয়েছেন। নীচ থেকে ল্যাক্‌লাইন দড়ির কলে টান দিলে শব্দ হয়—ঝন্ ঝন্,

কট-কট ক'রে। আজকাল মিত্তির বাড়িতে যখন-তখন বিকট শব্দ হলে পাড়ার লোক আর বড় বিস্মিত হয় না।

তবু গাছটা কেটে ফেলবেন না।

পাড়াশুদ্ধ লোককে ওঁরা বিরক্ত করবেন।

পুরোন সংস্কার, পূজো-আচ্চা অনেক কিছুই মিত্তির বাড়ির অন্দরমহলে ভক্তিসহকারে অনুষ্ঠিত হয়।—ইতুলক্ষ্মী, সত্যনারায়ণ, শুভচনী, ষেটেষষ্ঠী, শিব, আরো কত কি যেন। ব্রত, নিশিপালন, উপবাস কিছু বুঝি বাদ যায় না। খেরো বাঁধান পাঁজিতে যত রকম ক্রিয়া-করণের ব্যবস্থা আছে সবই প্রতিপালিত হয়—পাঁজির প্রতিটি পাতা পাঁচকড়িবাবুর পরিবারের সকলের মুখস্থ। তিন-মহলা বাড়ির প্রতি মহলের জন্যে একখানি করে পাঁজি আজো বরাদ্দ। পাঁজির পাতা অভ্রান্ত সত্য এ বাড়ির মনে।

পাঁচকড়িবাবু হয়তো পাঁজি দেখে আজ যাত্রা করেননি।

হয়তো ভেবেছিলেন এখান থেকে এইটুকু যাবেন আর আসবেন, পাঁজি দেখবার প্রয়োজন নেই।

এখন মনে হচ্ছে দেখলেই ভাল করতেন—এমন ভাবে কর্মনাশ হতো না। পুণ্য বলে বড় জোর বেঁচে গেছেন! হয়তো পাঁজিতে এই কথাই লেখা আছে—উত্তরে যাত্রা নাস্তি, দিবা ঘণ্টা...ইত্যাদি গতে যাত্রা বিধেয়।

ট্রাম থেকে নেমে একটা রিক্সা নিলেন পাঁচকড়িবাবু।

প্রতি পদক্ষেপে কেমন যেন গাড়ি-ঘোড়ার বিভীষিকা দেখছিলেন তিনি। হেঁটে যেতে সত্যিই তাঁর ভয় করছিল—যতক্ষণ না নিজের বাড়ি গিয়ে পৌছন ততক্ষণ স্বস্তি নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই!

বাড়ি পৌঁছে যেন হাঁফ ফেললেন পাঁচকড়িবাবু।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে একবার চোখ তুলে কি ভেবে আশপাশ ভাল ক'রে দেখে নিলেন।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, অনেককাল বাড়িটার চুণ-বালি-রঙ করা হয়নি। সেই যুদ্ধের পর থেকে ওতে আর হাতই পড়েনি। কেমন জবু-থবু দেখাচ্ছে যেন। একতাল মাটির রঙ-চটা, বিবর্ণ হাতির মত থেবড়া-থোবড়া!

আশ-পাশের সঙ্গে তুলনাই হয় না।

সেদিনকার বাড়ি-ঘর সব, যুদ্ধের বাজারে তৈরী—ফঙ্গবেনে!

বাইরেটাই চিকন-চাকন, ভিতরে কিছু নেই। তেমন-তেমন ভূমিকম্প হ'লে টিকবে না—কতটুকুই বা ভিত আছে মাটির তলায়!

মনে মনে আজ কিন্তু কোন সায় পান না পাঁচকড়িবাবু।

আশপাশ থেকে সবাই মিলে তাঁকে যেন চেপে ধরছে, নফরকুণ্ডু রোডের একাধিপত্য তাঁর নষ্ট হয়েছে।

বড়বাবু বলে সমীহ করবার লোকজন আর পাড়ায় নেই।...

সব নতুন, অপরিচিত, কে-কার কড়ি ধারে!

আত্মসম্মানে কোথায় যেন বড় লেগেছে।

ভবানীপুরের নফরকুণ্ডু রোডের মিত্তির বাড়ির বড়-কর্তা তা বলে গাড়ি চাপা পড়বে?

ট্রামে-বাসে চলাফেরা করেন বলে এতই হেয়, হীন পেয়েছে তাঁকে!

আজ না হয় গাড়ি নেই, এই সেদিনও তাঁর গাড়ি ছিল—তখন ভবানীপুরে খুব কম ঘরের গাড়ি ছিল।

এখন তো গাড়ি যোদো-মোদোরও হয়েছে!...

কালও যাদের পেটের ধান্ধায় পায়ের ছাল চামড়া ছিঁড়ে যেত তারাও আজ গাড়ি চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে, কালে কালে কতই দেখবেন পাঁচকড়িবাবু!

তার সাক্ষী ঐ সুকুমার।

কী ছিল ওরা, কী হয়েছে যেন আজকাল !

বলে কিনা, চলুন গাড়ি ক'রে পৌঁছে দিই আপনাকে !

যেন গাড়ি পাঁচকড়িবাবু কথনো দেখেননি !...গাড়ি চড়া শেখাচ্ছে !

এই সেদিনও পাঁচকড়িবাবু নিজের গাড়ি দিয়েছিলেন ছোকরাকে বিয়ে ক'রতে যাবার জন্যে।

এ-পাড়া, ও-পাড়া......হোক, তবু বর !

পাঁচকড়ি মিত্তিরের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বিহারীবাবুর।

একদা স্নেহের পাত্র কেমন ক'রে যেন ঈর্ষার পাত্র হয়ে গেছে।

যথোচিত বিনয় প্রকাশ করলেও কেমন যেন অহং ভাব দেখতে পেয়েছেন পাঁচকড়িবাবু সুকুমারের গাড়ি ক'রে যাওয়ার মধ্যে।

কোন দরকার ছিল না, ছোকরা তাঁকে দেখাবার জন্যেই গাড়িটা তাঁর চোখের ওপর বেঁধেছে।

এত কাল গাড়ি কোথায় ছিল ? ধরতে গেলে খেতে পেত না—

লোহার গেটটা টেনে বন্ধ ক'রে দিলেন পাঁচকড়িবাবু।

চেঁচিয়ে ডাকলেন, রামু ! রামু ! ওরে রামা !

শব্দটা অদ্ভুত প্রতিধ্বনি ক'রে উঠলো—উঃ !

উঃ ! উ—উ—উ—উ—

চলনের সরু পথটায় খানিক দাঁড়ালেন পাঁচকড়িবাবু।

প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেছে। লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে সদর রাস্তার আলোবাতাসে মিশে গেছে।

সুরটা এখনো কানে বাজছে ব্যাঙের মত।

বেটা 'রেমোর' এতবড় স্পর্দ্ধা !

ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করলেন পাঁচকড়িবাবু, রেমো হারামজাদা ! নচ্ছার কোথাকার ! এই বেটা !

ঘুলঘুলি পথটার পরেই আকাশ-চাওয়া উঠান, চারচৌকো।

আশ-পাশে ক'টা ঘর, বন্ধ দরজা, জানালা।

সামনেটা টানা প্রাচীরের মত, মাঝখানে একটা গেট তাও বন্ধ।

পাঁচকড়িবাবু উঠানে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলেন মুখ উঁচু ক'রে।

সেই আবার সদর বাড়ির কার্নিশে-কার্নিশে গোলাপায়রারা বসেছে।

এক দঙ্গল পায়রা তাঁর বাড়িটা লক্ষ্য ক'রে ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে আকাশে।

হাততালি দিয়ে পাঁচকড়িবাবু শব্দ ক'রলেন।

পায়রার জ্বালায় অস্থির, উঠানটা কিছুতে পরিষ্কার রাখবার উপায় নেই।

বংশ বৃদ্ধি দেখ না !

সেই কবে যেন শখ ক'রে পাঁচকড়িবাবুর বাবা চেতলার আড্ডিদের কাছ থেকে ক'টা পায়রা এনেছিলেন। তার থেকে এত !

জের আর মেটে না। এক যায়, এক আসে—লোটন, ঝোটন কত কি থেকে এখন ঐ গোলায় ঠেকেছে।

দু' চক্ষে দেখতে পারেন না পাঁচকড়িবাবু।

নেহাৎ নৈসর্গিক উপদ্রবের মত এগুলোকে সহ্য করছেন।

তাড়াবার অনেক চেষ্টা করেছেন, কোন ফল হয়নি। ঠিক এসে ঐ কার্নিশে আশ্রয় নেয় আবার !

ওদিকের গেটের চাবি খোলার শব্দ হলো।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, কে ? সিন্ধু !

গেট খুলে সিন্ধুবাসিনী ততক্ষণে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বললেন, রামুকে সুধার বাড়ি পাঠিয়েচি। জামাইকে বলে আসতে—

কি ! কি বলে আসবে ?

ধমকের সুর যেন বেরোয় পাঁচকড়িবাবুর গলা থেকে।

মুহূর্তের জন্যে সিন্ধুবাসিনী একটু যেন থমকে যান ভাইয়ের চড়া সুরে।

জামাইকে কি বলে আসবে, দাদা কি জানেন না? আজ নতুন নাকি?

সিন্ধুবাসিনী বললেন, কাল খুকীর মেয়ের বিয়ে। সুধাকে সঙ্গে নিয়ে যেন বিশ্বনাথ আসে।

পাঁচকড়িবাবু একটু অবাক হন।

কার বিয়ে? এই বাড়িতে!

সিন্ধুবাসিনী হাসলেন, মেজকীর পুতুলের বিয়ে।

পাঁচকড়িবাবু হঠাৎ চটে উঠলেন, পুতুলের বিয়ে! বুড়ো ধাড়ি মেয়েদের আর কোন কাজ নেই? পুতুলের বিয়ে!

সিন্ধুবাসিনীর মুখটা বেদনায় কেমন যেন হ'য়ে গেল।

বড় মুখ করে সংবাদটা দিতে এসে বড় অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলেন।

দাদা আজকাল কাকে কি বলেন খেয়াল থাকে না, মেজাজেরও ঠিক নেই।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, শখ করে কি আর বুড়োধাড়ি হয়েছে ওরা! আর, কি নিয়েই বা থাকবে! সাধ-আহ্লাদ ওদেরও আছে। পাত্র না জুটলে ওরা কি করবে? রাগ ক'রলে কি হবে?

আত্মজাদের প্রতি অহেতুক উষ্মা প্রকাশের জন্যে মনে মনে পাঁচকড়িবাবু বোধ হয় লজ্জিত হন। তাদের অকাল কুমারীত্বের জন্যে তিনিই তো দায়ী। উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান ক'রছেন না কেন? চেষ্টা করলে কি মনোমত ঘর মেলে না! বর পাওয়া যায় না? ছি, ছি, কাকে কি বলছেন আজ অহেতুক চিত্তবিক্ষেপে!

ভিন্নসুরে পাঁচকড়িবাবু বললেন, বিয়েটা হচ্ছে কার সঙ্গে?

সিন্ধুবাসিনী বললেন, রেবার ছেলের সঙ্গে।

পাঁচকড়িবাবু যেন থমকে উঠলেন, সে কি করে! শেষটা ঘরাঘরি! আর বর পেল না?

সিন্ধুবাসিনী বললেন, ঘরাঘরি তোমায় কে বললে? ছেলে রেবার নিজের নাকি!

পাঁচকড়িবাবু তেমনি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, তবে কার?

বরের ঘরের পরিচয় দিয়ে সিন্ধুবাসিনী বললেন, ওবাড়ির কমলার ছেলে। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কমলা রেবাকে মানুষ ক'রতে দিয়ে গিয়েছিল। সে তো আজ কতদিন, তারপর কমলা নিজেই শ্বশুর ঘর ক'রতে গিয়ে পাগল হ'য়ে গেল। কি করে, রেবাকেই এখন সব দেখতে হ'চ্ছে, ক'রতে হ'চ্ছে! হ'লই বা পরের, মানুষ ক'রেছে যখন নিজের মত। ছেলেটি ভাল।

পাঁচকড়িবাবু আর কি বলবেন যেন ভেবে পেলেন না।

কিছু একটা নিয়ে হৈ-হৈ না হ'লে যেন আর ভাল দেখায় না।

যা পারে ওরা করুক, দিক যত খুশি পুতুলের দিয়ে। বিয়েটা ভালোয় ভালোয় এখন হ'য়ে গেলেই নিশ্চিন্ত!

পাঁচকড়িবাবু জিজ্ঞেস করলেন, খরচ তুই করচিস্ তো? না, আর কেউ দিচ্চে?

সিন্ধুবাসিনী হাসলেন, আমি গরিব পিসি, আমি কোত্থেকে দেব। .....তুমি দিও। কত আর খরচ হবে!

পাঁচকড়িবাবুর বলবার যেন কিছু নেই।

খরচ তাঁকেই করতে হ'বে—ছেলেমেয়ে উভয় পক্ষই তাঁর মুখাপেক্ষী।

মীরাও যে রেবাও সে, শিপ্রাও সে, শান্তাও সে, রেখাও সে!

পাঁচকড়িবাবু বললেন, যাক্ গে, অল্পে সারিস। নেমন্তন্ন সব হ'য়ে গেছে?

সিন্ধুবাসিনী বললেন, সে তোমাকে ভাবতে হবে না দাদা। মেয়ে তো ঐ একটি নয় মেজকীর—

আবার আছে নাকি?

পাঁচকড়িবাবু যেন আঁৎকে উঠলেন, বলিস কি রে!

সাত সাতটি মেয়ে!

সিন্ধুবাসিনী রহস্য ক'রে হাসতে গিয়ে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন ভাই-এর মুখের দিকে চেয়ে।

পাঁচকড়িবাবুর মুখটা যেন কেমন হ'য়ে উঠেছে।

পাঁচকড়িবাবুও চুপ ক'রে রইলেন।

সাতটা মেয়ে যার তার ভাবনা নিশ্চয়ই কম নয় খরচপত্র সম্বন্ধে। বোঝবার কিছুই নেই।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হ'য়ে পাঁচকড়িবাবু জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, কেউ আসেনি তালতলা থেকে?

কেমন বেসুরো গলায় সিন্ধুবাসিনী বললেন, কই, না তো!

পাঁচকড়িবাবু বললেন, তা হ'লে ওদেরও পছন্দ হ'লো না। বেটারা কেন যে দেখতে আসে ঘটা করে!

সিন্ধুবাসিনী তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, না পছন্দ হোকগে!......ভালই হয়েচে, ও সম্বন্ধ কিন্তু আমার একটুও পছন্দ হয়নি। অমন নিজের বাড়ি কোলকাতায় অনেকের আছে!...বংশটা কি? সেই তো বাহাত্তুরে মৌলিক! সুধার বরের মত কুলীন হ'তো না হয় বুঝতুম!

হঠাৎ ভাইবোনের দু'জনেরই চোখে পড়ল—

পাঁচকড়িবাবুর পাঁচটি মেয়েই খাঁচায়-পোরা পাখির মত কখন মাঝের বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেমন উৎসুক ভাবে এদিকে চেয়ে আছে।

দু' তিন জনের কাপড়ে, হাতে হলুদের ছোপ-ছাপ।

ওদের মধ্যে মীরার উৎসাহটা যেন সমধিক প্রকাশ পাচ্ছে, পিঠের ওপর আলগা খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে, কপালের দু'পাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে, কোমরে-জড়ান ডুরে শাড়ির আঁচলটা খুলে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

অরক্ষণীয়া কন্যার বিয়ের গর্বে মীরাকে যেন আর চেনাই যায় না।

ছেলের মা রেবারই বরং মুখের ভাবটা কেমন-কেমন। বড় যেন ঠকে গেছে ছেলের বিয়ের ব্যাপারে! নেহাৎ গায়ে হলুদ হ'য়ে গেছে, না হ'লে বিয়ে সে ফিরিয়ে নিতো, সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতো।

ঐ তো মেয়ের ছিরি!

মনে হয় এই বিয়ের ব্যাপারে দেনা-পাওনা নিয়ে অভিযোগ ক'রে রেবা কি যেন বলতে যাচ্ছিল সিন্ধুবাসিনীকে, পাঁচকড়িবাবু খিঁচিয়ে উঠলেন, যত বয়েস হ'চ্চে তত আহ্লাদ বাড়ছে! পুতুলের বিয়ে! কচি খুকী সব! ধিঙ্গির মত দাঁড়িয়ে আছিস সেই? যা, যা, ভেতরে যা!

সিন্ধুবাসিনী মেয়েদের আড়াল ক'রে পাঁচকড়িবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল দাদা, শুধু শুধু মেয়েগুলোকে বকচো! যা-তা বলচো পাগলের মত!

তেমনি খেঁকিয়ে পাঁচকড়িবাবু বোনকে বললেন, তোর আস্কারাতেই তো মেয়েগুলো এমনি হয়েছে!...যত সব আদিখ্যেতা—পুতুল খেলা! পুতুলের বিয়ে দিচ্চেন, কড়ি খেলচেন! আর কাজ খুঁজে পেলেন না!

সিন্ধুবাসিনী ভায়ের মুখে মুখে এই প্রথম উত্তর করলেন।

কি কাজ ক'রবে শুনি? হুট্ হুট্ করে বাড়ির বাইরে গিয়ে মিত্তির বাড়ির নাম উজ্জ্বল করবে, না, পাঁচটা ছোঁড়া জুটিয়ে বাড়ির মধ্যে রাতদিন হা-হা, হো-হো ক'রবে? তোমার ভাগ্য ভাল যে, ওরা অনেক ভাল, এখনো কথার বাধ্য, সাত চড়ে রা কাড়ে না! অত বড় মেয়েকে বকতে তোমার লজ্জা করে না? বক কোন্ মুখে!

হয়তো নিজের অপরাধ পাঁচকড়িবাবু বুঝতে পারেন।

অকারণে এমনি বিচলিত হওয়া তাঁর উচিত হয়নি!

যা করুক ওরা বাড়ির মধ্যে খাঁচার ভেতরই ক'রছে—চোখের ওপরই রয়েছে। আজকালকার মেয়েদের মত নয়।

ছি, ছি, বাপ হয়ে এমন ক'রে বকাটা তাঁর উচিত হয়নি।

অনেক দিক থেকে ওরা ভাল মেয়ে। দুনিয়ার এতো পরিবর্তনে ওদের মনোভাবের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি—সেই জন্ম থেকে ওরা যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। ঐ পিসি আর ঐ অন্দরমহল ছাড়া আজো ওরা কিছু জানে না।

সামান্য পুতুলের বিয়ে দিয়ে যদি ওদের কিছু আনন্দ হয় পাঁচকড়িবাবু বাদ সাধেন কেন।

কি আর, কটা টাকা তাঁর খরচ হ'বে!

হোক্, সত্যিকারের কটা পয়সা তিনি খরচ করছেন মেয়েদের যুগোপযোগী করতে?

ধরতে গেলে কিছুই করেন নি—না গানবাজনা, না লেখাপড়া কিছুই শেখান নি।

তাও যদি সময় মত মেয়েদের বিয়ে দিতে পারতেন পাঁচকড়িবাবু, কিছুটা কর্তব্য করতেন।

ঐ তো মীরা, রেবা, রেখা!

কত বয়েস হ'য়েছে ওদের পাঁচকড়িবাবুর খেয়াল আছে?

বিয়ের কাল ওদের বহুকাল গত হয়েছে।

বাপ-ই হয়েছেন তিনি কেবল!

সিন্ধুবাসিনী মেয়েদের নিয়ে সরে গেলেন।

পাঁচকড়িবাবু অপ্রস্তুতের মত ফাঁকা উঠানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

বড় নির্জন মনে হলো তাঁর নিজের বাড়িটা—মনে হয় শহরের আমূল পরিবর্তনের এতটুকু আঁচ ভবানীপুরের নফরকুণ্ডু রোডের পুরোন মিত্তির বাড়িতে আজো বুঝি লাগে নি।

গেট বন্ধ ক'রে পুরোন সদর ঘরে চুপচাপ বসে থাকলে মনেই হবে না বাইরের জগত কিছুমাত্র বদলেছে।

সব হয়তো তেমনিই আছে।

বৈঠকখানার দরজাটা ঠেলে খোলবার আগেই ভেতরে ঘড়ি বাজলো ঢং-ঢং ক'রে।

কতকাল ধরে ঘড়িটা ঠিকই বাজছে—এতটুকু এদিক-ওদিক করেনি!

সপ্তাহে একদিন দম খেলেই যথেষ্ট, মুখ বুজে সময় সঙ্কেত করে যায় ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

গ্রাণ্ডফাদার ক্লক।

এক সাহেব বাড়ির নীলামে পাঁচকড়িবাবুর বাবা কিনেছিলেন। তখনকার দিনে হাজার বারশ টাকা লেগেছিল। ঘড়িটা দেখতে সে-সময় আত্মীয়-স্বজনদের ভিড় হতো সদরে। পাঁচকড়িবাবু তখন ছোট, দরজার একধারে দাঁড়িয়ে একবার ঘড়িটার দিকে তাকাত, একবার ভিড়ের দিকে চাইতো অবাক হয়ে।

পাঁচকড়িবাবুর বাবা সৌজন্য প্রকাশের ত্রুটি করতেন না। ঘড়ি দর্শনপ্রার্থী প্রত্যেককে মিষ্টিমুখ করাতেন।

রামহরির সে দোকানটা নেই, মিত্তির বাড়ির সামনে বোসেদের এঁদো পুকুরটার ধারে টিনের দোচালায় ময়রার দোকানটা তখন ছিল। বেশী বিক্রি হতো বাতাসা-মুড়কি। সন্দেশ, রসগোল্লা পালেপার্বণে।

এই ঘড়ির জন্যে রামহরিই নিয়েছিল দু'শ টাকা—জ্ঞান হ'য়ে জমা-খরচের খাতায় হিসেবটা পাঁচকড়িবাবু দেখেছিলেন।

ঘড়ির শখ পাঁচকড়িবাবুরও আছে।

কর্তা হ'য়ে ঘরে-ঘরে ঘড়ি টাঙ্গিয়েছেন।

নানা ছন্দে আট প্রহর বাজে।

নিষুতি রাতে মিত্তির বাড়িতে ঘড়িতে ঘড়িতে যেন কথা হয়।

কালের পদক্ষেপ স্পষ্ট শোনা যায়—ঠিক্-ঠিক্-ঠিক্!

ঘরে ঢুকে লোহার সিন্দুকটা খুলে ব্যাঙ্কের পাশ বইটা পাঁচকড়িবাবু রেখে দিলেন।

একটা বাঁধান খাতা টেনে কটা পাতা উল্টে কি যেন লিখলেন। খাতাটা বন্ধ ক'রে এক ধারে সরিয়ে রাখলেন।

হাত বাড়িয়ে খেরো মোড়া পাঁজিটা তুলে নিলেন—চোখ বুলিয়ে দেখলেন, আজ কোন দৈবদুর্ঘটনা যোগ আছে কিনা।

থাকলেও বার-তিথি, দণ্ড-পলের সঙ্গে তার শুভাশুভ ফলটা কি।

না, কিছুই বোঝা যায় না।

পুরুত মশাই ছাড়া কেউ ধরতে পারবেন না, জলের মত অনর্গল বলতেও পারবেন না চব্বিশ ঘণ্টার কোন্ ঘণ্টায় কি ঘটবে।

সত্যিকারের গাড়ি চাপা পড়লে কি হ'তো পাঁজিতে লেখা নেই।

কিন্তু পাঁচকড়িবাবু পৈতৃক বৈঠকখানা ঘরে একলা-একলা বসে বুঝতে পারেন, ফল কি হ'তো।

একটা ঢেউ-এর তলায় চিরকালের মত সব ডুবে যেতো। অন্ধকার চারিদিক! একমাত্র বংশধর ঐ কিশোর বালক বীরেশ্বর বা বীরু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হ'তো। বাড়ি-ঘর, আদব-কায়দা, চাল-চলন, ক্রিয়া-করণ রাতারাতি বদলে যেতো।

যে ছেলে তৈরী হ'য়েছে বীরেশ্বর!

এখনিই কাউকে গ্রাহ্য করে না, আদরে আদরে নষ্ট হ'য়ে গেছে।

পিসির আদর, মায়ের আদর, বোনেদের আদর।

হঠাৎ পাঁচকড়িবাবু ঘরে বসে চিৎকার করে ওঠেন কর্তব্যবোধে।

বিরু! বিরু! বিরে! হারামজাদা!

ডাক শুনে রামা এসে সামনে দাঁড়াল।

হাতে একটা বড় কাঁসার থালা। খঞ্চিপোষ ঢাকা দেওয়া।

চোখ তুলে পাঁচকড়িবাবু ধমক দিলেন, তোকে কে ডেকেছে! তুই যা! ছোটবাবুকে ডেকে দে!

উড়ে চাকর রাম বাবুর মেজাজ চেনে।

থালাটা হাত বদল ক'রে সামনে থেকে সরে গেল।

পাঁচকড়িবাবু ডাকলেন, এই শোন্, শোন্—

রামা ফিরে এল।

কাঁধের ওপর হাতের চেটোয় সন্দেশের থালাটা তেমনি আলগোছে ধরা।

খঞ্চিপোষটা ঝুলে আছে।

পাঁচকড়িবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কি রে! কোথেকে আনলি?

রামা হাসি মুখে বললে, বড়দিদিমণির বাড়ির তত্ত্ব অছি…মেজদিদিমণির মেয়ের বিয়া। দিদিমণি কাল আসিব।

সত্যি-সত্যিই যেন বিয়ে লেগে গেছে মিত্তির বাড়িতে!

কুটুম বাড়ি থেকে তত্ত্ব আসতে আরম্ভ করেছে!

সুধার কাণ্ড দেখ দেখি, জামাই কি ভাবছে।

ছেলেখেলায় কতকগুলো পয়সা নষ্ট। যেমন হ'য়েছে সিন্ধু, তেমনি এরা!

কোথাও কিছু নেই পুতুলের বিয়ে!

পাঁচকড়িবাবু বললেন, যা, নিয়ে যা, তোরই মজা।

রামা আবার হাসলে।

সারা পথ মনে মনে সে জল্পনা করে এসেছে মোটা কিছু আদায় ক'রবে। এক টাকার কম বিদেয় নেবে না কিছুতে।

পুতুলের বিয়ে তা হ'য়েছে কি, খরচ কি কম হবে?—

পাওনা-থোওনা কম হবে না তা বলে। পিসিমা আছেন!

বনেদী বড়লোক এঁরা, গা ঝাড়লেই পয়সা।

কটক থেকে রামা সাধে আর এখানে কাজ করতে আসেনি।

মাইনের টাকাটা পুরো দেশে পাঠাবে মাস গেলে তবে না চাকরি করা বিদেশে প'ড়ে-ঝ'ড়ে থেকে। কটক-পুরী-বালেশ্বর কম দূর নাকি!

রামা ভিতর-বাড়িতে চলে গেলে বার-বাড়িটা আবার কেমন যেন নিস্তব্ধ হ'য়ে যায়।

দ্বিপ্রহরের কোথায় কি, কার্নিশে-কার্নিশে পায়রাগুলো সশব্দে বিশ্রান্তালাপ শুরু করেছে এরি মধ্যে।

বড় মজা পেয়েছে সব!

বিরক্ত হ'য়েই ঘর থেকে পাঁচকড়িবাবু বাইরে বেরিয়ে এলেন।

একজোড়া ঘর-কুনো কবুতর ওধারের কার্নিশে বসে আছে। মদ্দাটা গলা ফুলিয়ে কোমর দুলিয়ে বক্-বকম্ ক'রে ঐটুকু জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা ক'রছে, মাঝে মাঝে বেচাল হ'য়ে ডানা ঝাপ্‌টে কার্নিশ আঁকড়াবার চেষ্টা করছে।

পায়রার উৎপাত কিছুতে গেল না মিত্তির বাড়ির ভিটে থেকে।

রাত দিন, সকাল-সন্ধ্যে উঁ-উঁ-কুঁ-কুঁ করে।

কি যে করে ওরা তার ঠিক নেই। নাকি যেখানে সুখ সেখানেই ওরা থাকে! এখনো মিত্তির বাড়িতে সুখ আছে!

সুখ না হাতি!

পাঁচকড়িবাবু নিজের মনেই ফুৎকার দিলেন।

সেকেলে কর্তাদের যেমন বুদ্ধি, মোটামোটা থাম তৈরি করেছিলেন, মাঝে আবার কার্নিশ আর পল তুলে দিয়েছিলেন কেন কে জানে—

ঐ পায়রা আর চড়ুই পাখিদের সুবিধে!

বীরুটা আবার ঐ দলে, বেজায় পায়রা পোষার শখ।

এখনো বাপের ভয়ে পাকা বন্দোবস্ত কিছু করতে পারে না, আর দু'দিন বাদে ক'রবে—বাড়িটাকে পায়রার আড্ডা করে ছাড়বে। নফর কুণ্ডু রোডের মিত্তির বাড়িকে একদিন চিড়িয়াখানা বানিয়ে তুলবে।

লুকিয়ে লুকিয়ে জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে নোংরা জীবগুলোকে আবার ছোলা খাওয়ান হয় বাবুর।

এই যে নবাবপুত্তুর আসছেন।

কোথা যাওয়া হ'য়েছিল এত বেলা পর্যন্ত!

ঠিক সামনে পড়ে যায় বীরেশ্বর।

হাতে কি? অ্যাঁ, কিসের ডিম ও? দেখি, দেখি! পাঁচকড়িবাবু ছেলের হাত ধরেন।

হাতের ডিম ছুটো আগলে চুপ ক'রে বীরেশ্বর দাঁড়িয়ে থাকে, কোন উত্তর করে না।

পাঁচকড়িবাবু চিৎকার করেন, বল্, হাতে কি? ডিম কোত্থেকে আনলি? কে দিলে? কিসের ডিম?

ছেলের কান ধরে পাঁচকড়িবাবু টান দেন আর কি।

যে রকম রেগে গেছেন তিনি।

বীরেশ্বর গোঁজমুখে বললে, পায়রার ডিম! শঙ্কর জ্যাঠার ওখান থেকে এনেছি।

আশ্চর্য, এত রাগ পাঁচকড়িবাবুর পায়রার ওপর, ছেলের মুখে সত্যিকথা শুনে একটি কথাও আর বলতে পারলেন না।

সাহস বলিহারি বীরেশ্বরের, বাপের মুখের ওপর সত্যি কথা বললে অকুতোভয়ে।

পিতাপুত্র ছু'জনেই যেন অবাক হ'য়ে গেছে উভয়ের ব্যবহারে।

ছেলের হাত ছেড়ে পাঁচকড়িবাবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিছু আর বললেন না ছেলেকে।

ওর যা খুশি করুক!

ঐটুকু ছেলে এতটুকু ভয়-ডর নেই—ভাবটা, পায়রার ডিম তার হ'য়েছে কি!

পায়রাগুলোকে গুলি ক'রে মারলে তবে রাগ যায়।

আর ছেলে কিনা দিব্যি বাইরের জঞ্জাল ঘরে আনছে!

বীরু খানিক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে হাফ্‌প্যান্টের পকেটে হাত দুটো পুরে বাপের সামনে থেকে সরে গেল।

মুখোমুখি দুটো গেটই খোলা খাঁ খাঁ করছে। সদর রাস্তা থেকে মাঝের বাড়ির উঠানটা এখন দিব্যি দেখা যাচ্ছে। বেআবরু।

আপাততঃ কোন্ দরজাটা বন্ধ ক'রলে দু'দিক বজায় থাকবে ভাবতে যেন পাঁচকড়িবাবুর সময় লাগে।

সদর দরজা, না, মাঝের বাড়ির দরজা?

শেষ পর্যন্ত গিয়ে পাঁচকড়িবাবু বাইরের গেটটা বন্ধ ক'রে দিলেন দড়াম করে।

যত গোলমাল ঐ সদরে। বলা নেই, কওয়া নেই কে কখন ঢুকে পড়বে। তারপর একটা কাণ্ড বাধতে কতক্ষণ!

সবে সদর গেটটা বন্ধ করে পাঁচকড়িবাবু পিছন ফিরেছেন, দেখলেন, মাঝের বাড়ির খোলা দরজাটা পেরিয়ে লীলাবতী এইদিকেই আসছেন।

গতিটা বড় মন্থর—দেহের ভারে যেন লীলাবতী নড়তেই পারছেন না।

একটা অদ্ভুত চিন্তা পাঁচকড়িবাবুর মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বিদ্যুৎ ঝলকের মত চমকে গেল।

শঙ্করদার কাবুলী বেড়ালটা বাচ্চা হবার আগে অমন ধারা নড়াচড়া করতো। রূপ যেন ফেটে পড়েছিল!

লীলাবতীর অবশ্য সে-আশঙ্কা নেই, কোলের মেয়েটার যথেষ্ট বয়েস হয়ে গেছে। পাঁচকড়িবাবুও বুড়ো হয়েছেন, যাট হ'তে আর ক'দিন বাকি!

সামনে এসে লীলাবতী বললেন, চানের আয়োজন হ'য়ে গেচে, এস।

কেমন যেন খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে করলো আজ স্ত্রীকে পাঁচকড়িবাবুর।

বড় সপ্রতিভ মনে হচ্ছে তাঁর লীলাবতীকে।

দেহ মেদবহুল হোক, তবু অনেক সুন্দর আপন আত্মজাদের চেয়ে লীলাবতী।

সিঁথির ওখানটায় অমন ভাবে টাক না পড়লে কে বলবে ইনি দ্বাদশ সন্তানের জননী। মুখটা একটু ভারী হ'য়েছে বয়েসে, তা না হ'লে—

ডল পুতুল!

পাঁচকড়িবাবু খিঁচিয়ে বললেন, তুমি এসেচ কেন, রামাকে পাঠাতে পারনি? বড্ড যে সাহস, হুট্-হুট্ ক'রে সদরে এসেচ! কার হুকুমে?

লীলাবতী স্বামীর কথা গায়ে মাখলেন না। জানেন স্বামীকে।

বললেন, অনেক বেলা হ'য়েচে, এস।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, কার হুকুমে!

লীলাবতীর মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হ'লো না।

বললেন, কার আবার হুকুম? তোমার!

আমার!

কণ্ঠের বিস্ময় উৎক্ষিপ্ত ক'রে পাঁচকড়িবাবু বললেন, আর কি, এবার সোজা বেরিয়ে যাও। স্বাধীন জেনানা!

মনে মনে বুঝি হাসলেন লীলাবতী।

হঠাৎ কেমন করে যেন তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, না গো, একান্ত তোমারই!

পাঁচকড়িবাবু অবাক হ'য়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন।

হঠাৎ লীলাবতীর মুখ ফুটলো কোথা থেকে? কে শেখালে তাঁকে এত কথা?

মাথার খোঁপায় আটকান, সোনাবাঁধান মিনে-করা 'পতি-পরম-গুরু' চিরুনীটা তো অনেকদিন সিন্ধু ভাঙিয়ে নতুন কি গয়না তৈরি করে দিয়েছে।

সাপ-মুখো সোনার কাঁটাগুলোও ভাঙা হ'য়ে গেছে সেই সঙ্গে।

পাঁচকড়িবাবু রহস্য করলেন, তাই নাকি! তা হ'লে এখনো মানো দেখচি!

বেশি নড়লে-চড়লে কিন্তু এত ভাল দেখায় না লীলাবতীকে।

এমনি স্থির থাকলে কড়ি-কড়ি পুতুল-পুতুল মনে হয়।

লীলাবতী নড়ে চড়ে বললেন, হ্যাঁগো, এস—বেলা হ'য়ে যাচ্ছে!

কি ভেবে পাঁচকড়িবাবু স্ত্রীকে বললেন, বেলা আজ একেবারেই হ'য়ে গিয়েছিল। তোমার পতি ভক্তির অনেক জোর, তাই রক্ষে পেয়েছি—আজ হ'য়ে গেছল আর কি!

লীলাবতীর মুখের ওপর হঠাৎ একটা ছায়া যেন নেমে এল।

একটু গলা কাঁপল।

সরে এসে বললেন, কি হ'য়েছিল গো? কি রক্ষে পেয়েচো?

পাঁচকড়িবাবু বিষয়টা লঘু ক'রতে বললেন, কিছু না। এই বলছিলুম—

লীলাবতী কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

স্বামীর আলাপ বুঝতে পারেন না। কিছু নয় তো রক্ষে হ'লো কী?

কি খেয়াল গেল পাঁচকড়িবাবুর, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ডানদিকের বৈঠকখানায় দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকটা দেখিয়ে বললেন, বলছিলে বেলা হ'য়েচে, বল দিকি এখন কটা বেজেচে?

লীলাবতী একবার স্বামীর মুখের দিকে একবার ঘড়ির ডায়ালের দিকে চেয়ে বললেন, কেন?

পাঁচকড়িবাবু গম্ভীর হ'য়ে বললেন, বলই না দেখি!

লীলাবতী ভয়ে ভয়ে থমকে-থেমে বললেন, বারোটা।

পাঁচকড়িবাবু মুখ ফিরিয়ে বললেন, হুম্। চল—

সঙ্গে সঙ্গে গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকে একটা ঘণ্টা বাজল।

ধ্বনিটা হাত ফসকে কোথায় যেন পিছলে গেল। কোন্ অতলে কে জানে।

লীলাবতী ভয়ে জড়-সড়।

দুপুরে খাবার সময় সুকুমারের কথা উঠলো।

পাঁচকড়িবাবুই তুললেন।

অদূরে বসে হাতের পাখাটা নাড়তে নাড়তে সিন্ধুবাসিনী জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছে তারা? কোথায় আছে আজকাল?

পাঁচকড়িবাবু বললেন, দেখে তো মনে হলো ভালই আছে। ঠিকানাটা জানা হয়নি। আসতে বলেছি একদিন—

সিন্ধুবাসিনী বললেন, দেশের খবর জিজ্ঞেস করেছিলে?

দেশ-টেশ্ বোধ হয় ওরা আর যায় না। দরকারই বা কি, এখানেই বেশ রোজগার-পাতি করছে মনে হলো! মটর চড়ে বেড়ায়—

পাঁচকড়িবাবু খবরটা বলবেন না, বলবেন না ক'রে যেন বলে ফেললেন।

সিন্ধুবাসিনীর হাতের পাখাও থেমে গেল সেই মুহূর্তে।

সুকুমার মটর চড়ে বেড়ায়!

হোক তাঁর ভাসুরপো, তবু যেন কেমন বিশ্বাস হয় না।

শিখুক লেখাপড়া তাতে গাড়ি চড়া যায় না, সিন্ধুবাসিনী ভাল ভাবেই জানেন। তাছাড়া কি এমন জজ-ব্যারিস্টার হয়েছে যার জন্যে গাড়ি চড়ে বেড়াবে! ঐ তো বি-এ পাস ক'রে সুকুমার কতদিন বসেছিল, পাঁচকড়িবাবু দয়া করে তিরিশ টাকার একটা চাকরি করে দিয়েছিলেন—ঐ সিন্ধুবাসিনীই কি কম বলেছিলেন সুকুমারের চাকরির জন্যে দাদাকে।

তারপর না হয় যুদ্ধ বেধেছিল কিন্তু তাতেই এত—

অবিশ্বাসের সুরে সিন্ধুবাসিনী জিজ্ঞেস করলেন, নিজের গাড়ি ? তুমি দেখেছো দাদা !

মনে তো হলো নিজের। নিজেই তো গাড়ি চালাচ্ছে দেখলুম। বিস্মিতা বোনের মুখের দিকে চেয়ে পাঁচকড়িবাবু বললেন।

হঠাৎ হেসে পাঁচকড়িবাবু বললেন, আর শুনেচিস্, আমাকে তার গাড়িতে ক'রে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। বেশ ছেলে—ভদ্র, বিনয়ী, নম্র।···আজকালকার ছেলেদের মত নয় !

সিন্ধুবাসিনী পাখাটা নাড়তে নাড়তে বললেন, হোক, হোক ! শুনতে ভাল, দেখতে ভাল ! ভগবান মুখ তুলে চেয়েচেন এ্যাদ্দিনে। তুমিই তো বলতে কতদিন, সুকুমার ঠিক উন্নতি করবে দেখিস !

সুকুমার সম্বন্ধে পাঁচকড়িবাবুর সে-ভবিষ্যদ্বাণী হয়তো মনে পড়ে, হয়তো মনে পড়ে না।

কতদিনের কথা। লেখাপড়া শেষ করে সুকুমার পাঁচকড়িবাবুকেই কতদিন মুরুব্বি ধরেছিল, তিরিশ টাকার চাকরি পেয়ে একদিন বর্তে গিয়েছিল !

সেই সুকুমার, তার সম্বন্ধে যদি কোন সফল ভবিষ্যদ্বাণী পাঁচকড়িবাবু করে থাকেন তা হলে তার কৃতিত্ব তাঁরই।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, চাকরি করেনি তাই। বুদ্ধিমানের কাজ করেছে ব্যবসা করে।

সিন্ধুবাসিনী জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যবসা করে সুকুমার ?

তা জানি না, জিজ্ঞেস করা হয়নি। মনে হয়, ভালই কিছু করে। এখনো না হলে গাড়ি চড়ে ! যুদ্ধের বাজার তো কবে শেষ হয়ে গেছে ! পাঁচকড়িবাবু বললেন।

সিন্ধুবাসিনী মনে মনে কি যেন ভাবতে থাকেন ভাসুরপোর সম্বন্ধে।

সব যেন চোখের ওপর সবিস্ময়ে ভেসে উঠেছে—সুকুমার, তার লেখা-পড়া শেখা, দু'বেলা তাঁর কাছে এসে সুখদুঃখের কত গল্প করা।

আশ্চর্য, এত কাছে থেকে, এত মেলামেশা ক'রে কোনদিন সুকুমারের এই ভবিষ্যৎটার কথা তাঁরা কেউ ভাবতে পারেননি—সামান্য একটা পাস-করা ছেলে কোনদিন গাড়ি চড়ে বেড়াতে পারবে!

মনে মনে হয়তো উন্নতির আশীর্বাদ সিন্ধুবাসিনী সুকুমারকে করেছেন, কিন্তু এমনি ক'রে তা যে সফল হবে মনের কোণে স্থান দেননি—স্বপ্নেও কল্পনা করেননি।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, ব্যবসা তো ওদের ছিল এক কালে। কম বড় নাকি! আমার বিয়ের সময় কি রম্‌রমারম্‌, তোমার মনে নেই দাদা?......

অন্যমনস্কভাবে পাঁচকড়িবাবু বললেন, সে যাই হোক, সুকুমার নিজের পায়েই দাঁড়িয়েচে......বাহাদুর ছেলে!

আজ দাদার মুখে কথাটা কেমন শোনাল যেন।—

সুকুমার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে!

এ বাড়ির মতে যাদের বাপ ঠাকুরদার কিছু নেই তারা মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়। যোগ্যতার যাচাই-এ তারা টিকতেই পারে না।

শুধু ভাল ছেলেতে কিছু হয় না। ভবানীপুরের পুরনো মিত্তিররা তাদের খাতিরই করেন না, দর দেন না।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, ও বরাবরই অমন। বংশের আরও তো ছেলে আছে, কিন্তু সুকুর মত কেউ নয়। আহা, বেঁচে থাক!

পাঁচকড়িবাবু বললেন, ছেলের চাকরির জন্যে বিহারীবাবু কালো মেয়ের সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। এখন কি হচ্ছে!…কোথায় রইল সে চাকরি!…

সিন্ধুবাসিনী বললেন, মেয়ের ভাগ্য, কপালে সুখ আছে। চাকরিটা উপলক্ষ্য—না হলে বিয়ে হবে কেন।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, সে মেয়েকে তো তুই দেখেছিস, কাঁসারীপাড়ার হরিচরণ ঘোষের মেয়ে। হরিচরণ ঘোষ জাহাজে মাল দিয়ে খুব পয়সা করেছিল। তখন-তখন প্রায়ই দেখা হতো রাস্তাঘাটে……

স্পষ্ট মনে পড়ে না সুকুমারের বৌ-এর মুখটা সিন্ধুবাসিনীর।

সেই বোধ হয় দ্বিতীয়বার সিন্ধুবাসিনী শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন।

কেমন ভাল লাগেনি বিয়েবাড়িটা।

হরিচরণ ঘোষ বোকা, তাই অজ পাড়াগাঁয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।

জিনিসপত্রও দিয়েছিল তেমনি ঠেসে!

কালো!

সে-কথা ঠিক।

কিন্তু তাতে কি!

সেদিন সুকুমারই জিতেছে মনে হয়েছিল সিন্ধুবাসিনীর।

হরিচরণ ঘোষের বোন হলে এ বিয়েতে নিশ্চয়ই আপত্তি করতো।

হোক সুকুমাররা তার নিকট সম্পর্ক- স্পষ্ট কথা বলতে তাঁর ভয় নেই।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, বৌটার কপাল! কার বরাতে কি হয় কে জানে।

হরিচরণ ঘোষ কপাল ঠুকে কেবল ছেলে দেখেই মেয়ে দিয়েছিলেন! কালো মেয়ে তো উদ্ধার হয়ে গেল।

পাঁচকড়িবাবু চুপ করে রইলেন।

হরিচরণ ঘোষ যা পারেন, তিনি তা পারেন না।

হরিচরণ ঘোষের মত আময়দার পয়সা নয় তাঁর। নেংটার নেই বাট-পাড়ের ভয়!

তা ছাড়া ওঁদের বংশ আর তাঁর বংশ!

মেয়ের বিয়ে নিয়ে অমনি যা তা করলেই হলো!

আজ না হয় সুকুমারের অবস্থা ফিরেছে, না হলে?

মেয়েরও দুঃখু নিজেরও দুঃখু!

পয়সাগুলো জলে দেওয়া!

দোরের পাশে মীরা এসে দাঁড়াল।

সামনের দেয়াল-জোড়া আয়নাতে ছায়া পড়তে সিন্ধুবাসিনী চোখ তুলে চাইলেন।

বললেন, কি রে!

বাপের সামনে মীরা যেন ভয়ে জড়-সড়।

পাঁচকড়িবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে দেখলেন না। হঠাৎ তাঁরও যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ হলো।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, বল্ কি বলবি!

খুব নীচু সুরে মীরা বললে, বাবার খাওয়া হ'লে তুমি একবার এদিকে এস।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, কেন?

মীরা তেমনি আস্তে আস্তে বললে, সে বলব'খন, তুমি এসোনা!

শেষ ভাতের গ্রাসটা মুখে তুলতে গিয়ে হঠাৎ মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে পাঁচকড়িবাবু থেমে গেলেন। নিজের মেয়ের বিয়ে দেওয়ারই সময় হয়েছে মীরার—কত বড় হয়ে গেছে, নিজের মেয়ে বলে বিশ্বাসই হয় না পাঁচকড়িবাবুর।

কেমন যেন লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন পাঁচকড়িবাবু।

আর চেয়ে না দেখলেও বুঝতে পারেন, মনে মনে যেন দেখতে পান পরপর অনেকগুলো ছায়া মীরার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

কন্যা-পার ব্যাপারে সিন্ধুবাসিনীকে তাদের বড় প্রয়োজন।

এই বাজারে মেয়ের বিয়ে দেওয়া মুখের কথা নয়!

শেষটা পাঁচকড়িবাবুই বললেন, যা না, দেখ্‌না ওরা কি বলে।

সিন্ধুবাসিনী কেমন অবাক হয়ে ভায়ের মুখের দিকে চান।

ওরা আবার এল কোত্থেকে—একা মীরাই তো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে

হঠাৎ দাদার মেজাজও বদলে গেছে!

এই মুহূর্তে বাইরে থেকে কেউ এলে কিছুতে ধারণা করতে পারবে না যে, মিত্তিরবাড়িতে সত্যিকারের কোন বিবাহ-উৎসব নেই—আলোক-সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে তিন-মহলা বাড়িটা একটা মিথ্যের অভিনয় করছে; পাঁচকড়িবাবু সদর বাড়ির সবগুলো আলো জ্বালিয়ে কারো জন্যই অপেক্ষাই করছেন না।

ভিতর থেকে ক'বার যেন উঠ-উঠি শাঁখের আওয়াজ ভেসে এল।

শব্দটা কানে পৌঁছতে পাঁচকড়িবাবুর কৌতুকের মত মনে হল।

সিন্ধুবাসিনী আচ্ছা আরম্ভ করেছে মেয়েগুলোকে নিয়ে।

যা করিস করিস, নিজেদের মধ্যেই কর, বাইরে লোক জানাজানি কেন শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে!

একেই তো পাড়ার লোকের ঘুম হচ্ছে না। বড়কর্তা আর মেয়েদের বিয়ে দেবে না!

ব্যাপার কি, আজই বিয়ে লাগল নাকি পুরনো মিত্তির বাড়িতে? সবকটার এক সঙ্গে নাকি!

আহা, হোক, হোক!

নিমন্ত্রণ ফাঁক যাওয়ার জন্যে পড়শীরা রাগ করছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু মনে মনে তাঁরা খুশী হয়েছেন এই ভেবে—বড়কর্তার অবস্থা তাহলে কাহিল! ঐ দেখতেই—

সদর দরজাটা খোলা ছিল।

দু'একজন যেন উঁকি মেরে গেছে এর মধ্যে—রহস্য দেখতে এসেছিল মনে হলো পাঁচকড়িবাবুর।

কতবার হারামজাদা রামাকে বলা হয়েছে পৈ-পৈ করে, যখন বাইরে যাবি দরজাটা টেনে বন্ধ ক'রে দিয়ে যাস।

বেটা গ্রাহ্যই করে না। সেই খুলে রেখে যাবে।

উঠে এসে পাঁচকড়িবাবু দরজাটা বন্ধ করে দিলেন খিল এঁটে।

কারো নিমন্ত্রণ নেই।

এখন কৌটোর মত হয়ে গেছে বাড়িটা।

বাইরের জগতের সঙ্গে একেবারে বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন।

নিজের বক্ষস্পন্দন ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না এখন।

ঘুরে এসে পাঁচকড়িবাবু ডানদিকের বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

সামনের আলোটা নিভিয়ে দিলেন। ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল।

খানিক পরে পাশের ছোট্ট ঘরটায় আলো জ্বলে উঠলো দপ্ ক'রে।

ঘরে ঢোকবার সময় পাঁচকড়িবাবু পর্দাটা ফেলে দেননি বলে ঘরের সমস্তটা এখন দেখা যাচ্ছে—

এক ধারের দেওয়াল ঘেঁষে একটা আরাম-কেদারা পাতা আছে। আর একধারে একটা টেবিল পাতা, গুটি দু'তিন গদি-আঁটা চেরা কাঠের চেয়ার পাতা। টেবিলের ওপর পর পর কটা ফুলপাতা কাটা কাঁচের গ্লাস সাজান। একটা কাঁচের বড় বয়াম। ঘরটা ডিস্‌টেম্পার করা। সিলিং-এ ঝোলান পাখাটায় লাল শালুর ঘেরাটোপ জড়ান।

চাবির গোছা বেছে বেছে বিশেষ একটি চাবিকাঠি বার ক'রে দেওয়াল আলমারির গায়ে লাগিয়ে পাঁচকড়িবাবু ঘোরালেন।

কুট করে শব্দ হল।

তারপর পাল্লাটা টেনে খুলে ফেললেন, জিনিসটা সামনেই ছিল।

এক হাত বাড়িয়ে নিয়ে আলমারিটা আর এক হাতে ঠেলে বন্ধ ক'রে দিলেন।

খানিক চুপ-চাপ আরাম-কেদারায় বসে রইলেন।

আলোতে কাঁচের পাত্রগুলো চিক্-চিক্ করতে লাগল।

বোধ হয় অনেকক্ষণ পরে কি, তক্ষুণি!

সদর দরজায় যেন ঘা পড়ল।

পাঁচকড়িবাবু হয়তো শুনলেন, হয়তো শুনতে পেলেন না।

ঢক্-ঢক্ করে গেলাসে তরল পদার্থ ঢালার শব্দ হতে লাগল।

কে কোন্ শব্দ অত শোনে!

আরো কিছুক্ষণ পরে পাঁচকড়িবাবু ঘরের বাইরে এসে উঠানে স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। পা কাঁপতে লাগল। দেহ টলতে লাগল। সব যেন কেমন ঘুরতে লাগল। বাড়িটা যেন নীচের দিকে ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছে!

আলোগুলো সব কখন ঘোলা হ'য়ে গেছে।

সব চুপচাপ।

ভিতর বাড়িতে কোন সাড়াশব্দ নেই।

পাঁচকড়িবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, কেন শব্দ হবে? কি শব্দ? কে শব্দ করবে!

মাঝের বাড়ির দরজা ঠেলে রামা বেরিয়ে এল।

বাবুকে এ-ভাবে দেখে সে কেমন যেন চমকে গেল।

ভয়ের কিছু নেই। না জানবারও কথা নয়। নতুন কিছুও নয়।

তবু রামার ভয় করল।

চুপিচুপি রামা পাশ কাটাবার চেষ্টা করলে।

পাঁচকড়িবাবু চিৎকার ক'রে উঠলেন, কোথা পালাচ্চিস হারামজাদা ?

রামা চুপ করে একধারে দাঁড়িয়ে রইল।

পাঁচকড়িবাবু যেন ক্ষেপে গেলেন, তুম্ কোন্ হ্যায় ? উল্লুক, শুয়ার, গাধা, পাজি !

রামা কাঠের পুতুলের মত স্থির।

গালাগালকে তার ভয় নেই, ভয় তার বাবুকেই।

নেশার ঝোঁকে এখনি হয়তো মারধোর করবেন !

রামা পা-পা পিছোতে লাগল, পাঁচকড়িবাবু গুটি গুটি এগুতে লাগলেন। খানিক প্রভু-ভৃত্য কানামাছির মত উঠানটা প্রদক্ষিণ করতে লাগল।

রামার হয়েছে মুশকিল, থামবার উপায় নেই—ধরা পড়লেই জুতো, নয়, কিলচড়।

ঘুরতে ঘুরতে পাঁচকড়িবাবু টাল সামলাতে না পেরে শ্বেতাঙ্গনা একটা প্রস্তর মূর্তিকে জড়িয়ে ধরলেন।

মূর্তিটা অনেক কালের। কোম্পানির আমল থেকে মিত্তির বাড়ির শোভা বর্ধন ক'রে আসছে। অপ্রকৃতিস্থ মালিকের বাহুবন্ধন ছুটে মূর্তিটা ছিট্‌কে মেঝেয় পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ধড়, মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

পাঁচকড়িবাবু চিৎকার ক'রে উঠলেন, সব ভেঙে ফেললে হারামজাদা ! ভাঙ্! ভাঙ্ !

ভিতর বাড়িতে তখন ঘন ঘন শাঁখ বাজছে।

পাঁচকড়িবাবুর চিৎকার ভিতরে কারো কানে গেল না।

রামা ফাঁক কেটে এক সময় সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাবুর উন্মত্ত অবস্থা আজ তার কাছে নূতন, মাল খেয়ে এমন বেলেল্লাপনা তিনি কখন করেন না।

বৈঠকখানার পাশে চোরা কুটুরীর মত ঐ ছোট্ট ঘরটায় বসে বাবু একলা-একলা মদ খান—সাজ-সরঞ্জাম রামাই ঠিক করে রাখে বিকাল থেকে।

মাঝে মাঝে বাবুর দু'পাঁচজন বন্ধুও আসেন। সেদিন রামার কাজ বেড়ে যায়—ঠায় সদরে অপেক্ষা করতে হয়, কখন কি হুকুম হয়।

কিন্তু সবটার মধ্যে কেমন একটা চুপচাপ ভাব ছিল। বাবু যখন রাত দুপুরে অন্দর-মহলে প্রবেশ করতেন তখন বোঝবারই উপায় ছিল না, এতক্ষণ বাবু চোরা কুটুরীতে বসে গুচ্ছের মদ গিলেছেন! একেবারে স্বাভাবিক মানুষ।

মাঝ-বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে শেষবারের মত রামাকে হেঁকে বলতেন, দরজা-টরজাগুলো ঠিক করে দিয়েচিস তো। গেটে চাবি লাগিয়েচিস? আর একবার ভাল ক'রে দেখ্‌ চারদিক ঘুরে!

একটুও গলা কাঁপতো না, স্বর বিকৃতি ঘটতো না।

বনেদী মাতাল, কার সাধ্য বুঝবে—বাড়ির লোক তাই জানে নাকি কেউ।

কিন্তু আজ একি হলো!

সদর দরজাটা খুলে রেখেই রামা ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

একেবারে চোখ বুজে দৌড় দিলে। বলা যায় না, বাবু পিছন পিছন ছুটে আসছেন হয় তো! ঝক্‌মারী বাবুর বাড়ি চাকরি করা। রাতদুপুরে ছোটাছুটি!

পাঁচকড়িবাবুর যখন জ্ঞান হলো তখন তিনি সহজেই ভাবতে পারলেন—ভিতর-বাড়িতে নিজের বিছানাতেই তিনি শুয়ে আছেন।

রাত অনেক হয়েছে।

তাঁর পালঙ্কের পাশে একটা চেয়ারে এক ভদ্রলোক বসে আছেন পিছন ফিরে।

কে?

বড় জামাই নয় তো? ছি, ছি, কি কেলেঙ্কারী। বিশ্বনাথ সব দেখেছে তা হলে। শ্বশুরমশায়ের ভীমরতি হয়েছে! কাজকর্মের বাড়িতে মদ খেয়ে বেহুঁশ, বেতাল! যা কখ্খনো হয়নি—

নিঃশ্বাস চাপতে গিয়ে বুঝি ফুঁপিয়ে উঠলেন পাঁচকড়িবাবু।

সুকুমার শব্দ পেয়ে মুখ ফেরালে।

দু'জনেই দু'জনকে দেখে বিস্মিত হল।

সুকুমার এত রাত্রে কোত্থেকে? এত কাল পরে!

পাঁচকড়িবাবুর কি হয়েছে?

গাড়ি চাপা পড়েছিলেন! সুকুমার রাস্তা থেকে কুড়িয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে!

সুকুমার জিজ্ঞেস ক'রলে, এখন কেমন আছেন?

বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে পাঁচকড়িবাবু বললেন, কেন, কি হ'য়েছে আমার?

সুকুমার বুঝতে পেরে বললে, না, কিছু না। কেমন লাগছে?

উঠে বসবার চেষ্টা ক'রে পাঁচকড়িবাবু বললেন, ভালই। তুমি কতক্ষণ এসেছো?

অনেকক্ষণ! সুকুমার অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলে।

এরা সব গেল কোথায়? তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে? পাঁচকড়িবাবু ব্যস্ত হ'লেন যেন।

হ্যাঁ। সুকুমার বললে, ভেতরে আছেন।

তোমার কাকীর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে? সিন্ধু! সিন্ধু! পাঁচকড়িবাবু ডাকবার চেষ্টা ক'রলেন।

আপনি ব্যস্ত হবেন না, দেখা আমার সবার সঙ্গেই হয়েছে। আপনি চুপ করুন! আবার—

পাঁচকড়িবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আবার কি! সব গেল কোথায়? এ কি রকম ব্যবস্থা, তোমাকে একলা বসিয়ে রেখে চলে গেল!

আমিই বসে আছি। আপনি স্থির হোন। এখনি সব আসবে।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, আসবে! কেন, কি রাজকার্য করছে সব? একজন কুটুম মানুষকে এমনি ক'রে বসিয়ে রাখবে তা বলে! আক্কেল বিবেচনা নেই!

বড় অপ্রস্তুত বোধ করে সুকুমার।

অথচ অবস্থাটা ঠিকমত বুঝিয়েও বলতে পারে না।

এতক্ষণ কি যে কাণ্ড পাঁচকড়িবাবু করছিলেন! আশপাশে কারো থাকবার উপায় ছিল!

সুকুমার ঠিক সময়ে এসে না পড়লে এতক্ষণে অন্যরকম সোরগোল পড়ে যেত বাড়িতে।

একটা শ্বেত পাথরের মূর্তি বুকে নিয়ে পাঁচকড়িবাবু চিৎ হ'য়ে গোঁ-গোঁ করছিলেন।

ভাগ্যে সুকুমার এসে পড়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছিল!

বাইরে থেকে মুহুর্মুহু শাঁখের শব্দ শুনে গলি পথটায় থমকে খানিক দাঁড়িয়েছিল সুকুমার।

বাড়িতে কারো বিয়ে লেগেছে?

রবাহুত হ'য়ে উপস্থিত হওয়া তার উচিত হবে না এখন।

ফিরে যাবে কিনা সুকুমার ভাবলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

শাঁখের শব্দ থামতে গোঙানিটা সুকুমার শুনতে পেলে।

কালবিলম্ব না ক'রে ত্বরিত পায়ে এগিয়ে এসে যা দেখলে তাতে বিস্ময়ের অবধি রইল না—

প্রায় বিবস্ত্র পাঁচকড়িবাবু, বুকের উপর পাথরের স্ট্যাচু উপুড় হ'য়ে পড়ে, আশেপাশে গোটা দুই মূর্তি ভাঙাচোরা!

বেশ বোঝা যায় নিভৃতে একটা খণ্ড প্রলয় হ'য়ে গেছে।

পাঁচকড়িবাবু অপ্রকৃতিস্থ।

তারপর হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, জানাজানিতে ভিতর-বাড়ির সব আনন্দ-কোলাহল মুহূর্তে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

সবাই মিলে এসে পাঁচকড়িবাবুকে ধরাধরি ক'রে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড হবে কেউ কল্পনা ক'রতে পারেনি।

আজকের দিনে এ কি হ'লো, পাঁচকড়িবাবু এ কি করলেন— নিজেকে এ কি ক'রে প্রকট করলেন ?

আভিজাত্যের এ কী নির্মম অপঘাত!

ছি!

বাপের জন্য মেয়েগুলোর বেদনাই যেন বেশি।

সুকুমারের সামনে বলেই যেন তাদের লজ্জার সীমা নেই।

আজকের সুকুমারদা তাদের কাছে বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কি!

কি মনে করছেন উনি!

সিন্ধুবাসিনী কিন্তু নিজেকে অবস্থার সঙ্গে অনেকটা মানিয়ে নিয়েছেন।

যেন কিছুই হয়নি, দুর্ঘটনার জন্য আবার কে দায়ী!

সুকুমারকে শুনিয়ে বললেন, কি গেরো দেখ দিকি! দাদাকে কতদিন বলেচি ঐ সব জ'গদ্দল পাথরগুলোকে দূর ক'রে দাও, স্থানে, অস্থানে কার কখন লাগবে বলা যায় না! আজ হ'লো তো! ভাগ্যে তুই এসে পড়েছিলি বাবা, কি সর্বনাশটা হ'তো তা না হ'লে—

হঠাৎ মেয়েদের দিকে ফিরে সিন্ধুবাসিনী বললেন, তোরা এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস ? যা যা বর-কনে একলা পড়ে আছে।

অবস্থা বুঝে সুকুমার বললে, হাঁ, এখন ওঁর একলা থাকা উচিত। তোমরা যাও আমি থাকচি।

মুশকিল হয়েছিল গন্ধটাকে নিয়ে।

অবুঝ নয় মেয়েরা, তারা সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়েছিল।

সিন্ধুবাসিনী বুঝি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। সুকুমারকে বললেন, বুড়ো বয়েসে কি কীর্তি করচেন! এত বড় বড় মেয়ে সব!

সুকুমার কোন মন্তব্য করলে না।

পাঁচকড়িমামার এ অবস্থা এসে দেখতে হবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

তার অনেকদিনের শখ ছিল, যদি কোনদিন অর্থের প্রাচুর্য হয় তাহ'লে ভবানীপুরের নফর কুণ্ডু রোডের পাঁচকড়ি মামার মত বাস করবে—অমনি বড়মানুষী করবে। কোন কিছুর অভাব থাকবে না, ছিমছাম ফিটফাট সব সময়!

বড়লোক মাত্রেই মদ খায়।

কিন্তু এমনটা করে না। ক'রলে সেটা অধঃপাতেরই লক্ষণ বলে ধরা যায়।

পুরোন মিত্তির বাড়ির অধঃপতন শুরু হয়েছে।

বাড়ির মধ্যে মদ খেয়ে রাস্তার মাতালের বেহদ্দ।

একি অবস্থা পাঁচকড়িমামার, এতগুলো মেয়ের এখনো বিয়ে দেননি! এতদিন তাহ'লে কি করেছেন? এত পয়সায় মেয়েদের যোগ্য পাত্রের সন্ধান পাননি, না, নিজের খেয়ালে নিজেই আছেন? না, দিনকাল বুঝে জমানো পয়সা খরচ ক'রতে ইতস্তত ক'রছেন?

ভিতরে ঢুকে খুব বেশি পরিবর্তন কি চোখে পড়েছে সুকুমারের—এক মানুষগুলো ছাড়া!

সেই বিরাট বাড়ি, সেই আসবাবপত্র, সবই বজায় আছে।

তবে আগের সেই মুখরতা নেই, কেমন যেন সব নির্জীব, নিস্তব্ধ।

সদরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তাই সুকুমারের সামলাতে সময় লেগেছিল।

ভিতর-বাড়ির সাড়া শব্দর সঙ্গে বার-বাড়ির কোন সম্পর্কই যেন নেই।

সেই থেকে সুকুমার একলাই আছে পাঁচকড়িমামার তদারকে। সিন্ধুবাসিনী বললেন, কখনো এমন করে না দাদা। কাল থেকে কি যে হ'য়েছে—যাকে যা নয় তাই বলছেন, নিজেরও কি হ'য়েছে! জানিস সুকুমার আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই। কেবল মেয়েগুলোর জন্যে···

সুকুমার কি বলবে ভেবে পেল না।

অনেক দিন পরে সে এ বাড়িতে এসেছে। অনেক আশা বুঝি নিয়ে এসেছিল···অনেক প্রত্যাশা করেছিল!

সেই সুকুমার আর এই সুকুমার যে অনেক তফাৎ!

বুঝি নিজেকে দেখাবার একটা গোপন ইচ্ছে ছিল সুকুমারের।

কিন্তু এসে একি দেখলে—

একটু বুঝি দুঃখ হয় সুকুমারের।

হাজার হোক পাঁচকড়িমামা এককালে তার শুভানুধ্যায়ী ছিলেন।

এ বাড়ির অনেক অন্ন ধ্বংস করেছে বিনা নিমন্ত্রণে। নিজেকে ধন্য মনে করেছে পুরোন মিত্তির বাড়ির একজন আত্মীয় ভেবে। এ বাড়ির অনেক উৎসবে একদা সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রেছে।

সে-সব দিনের কথা মনে পড়েই এ বাড়ির জন্যে দুঃখ হয়।

হয়ত ঠিক তা নয়।

কেমন একটা মানসিক অবসাদ বোধ করে সুকুমার।

তার কৃতিত্বের মূল্য বোঝবার, মর্যাদা দেবার কোন ক্ষমতাই আজ পাঁচকড়িমামার নেই।

যে পাঁচকড়িমামাকে সুকুমার জানতো, এ পাঁচকড়িমামা তিনি নন। এঁর মুখের কোন প্রশংসা বাক্যে সুকুমার বুঝি সন্তুষ্ট হবে না।

কোথায় গেল সে আভিজাত্য ভবানীপুরের পাঁচকড়ি মিত্রের?

বিছানায় শায়িত ঐ লোকটি কত যেন অসহায়!

খানিক চুপ করে থেকে পাঁচকড়িবাবু বললেন, দেখলে তো এদের ব্যাভারটা! একটা লোক এলো কি গেল, গ্রাহ্যই নেই। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি না হয় মদ খেয়েচি। তা বলে তুমি?

সুকুমার এতক্ষণে যেন বিশেষ লজ্জা পেল।

কি বলছেন এসব পাঁচকড়িমামা নিজ মুখে?

সুকুমার বললে, আমি ঠিক আছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

এবার পাঁচকড়িবাবু চটে উঠলেন, সাধে আর ব্যস্ত হই, কি রাজকাজ ক'রচে সব! তুমি ঘরের লোক, না হয় কিছু মনে করবে না। যদি বিশ্বনাথ হ'তো কি মনে করতো? পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে, না, আমার ছ্যাদ্দ হচ্ছে। সিন্ধুটাও হ'য়েচে তেমনি!

খানিক থেমে হঠাৎ পাঁচকড়িবাবু স্বর নামিয়ে বললেন, তুমি তো অনেক খোঁজখবর রাখ সুকুমার। মেয়েগুলোর জন্যে পাত্তর দেখো না।

সুকুমার চুপ করে থাকে।

সে দেখবে কিনা মিত্তির বাড়ির মেয়েদের যোগ্য পাত্র।

হঠাৎ পাঁচকড়িমামার তাঁকে এতটা বিশ্বাস করবার কি কারণ ঘটলো।

সুকুমার আবার কি পাত্র যোগাড় করে দেবে?

মনে পড়ে বই কি!

সুধারও বেশ বয়েসে বিয়ে হ'য়েছে।

সুকুমার তখন সবে পাস করেছে—এ বাড়িতে নিত্য আসা-যাওয়া।

এক এক দল মেয়ে দেখা শেষ করে যায় আর বাছ-বিচারের বৈঠক বসে ভাই-বোনে। ঘর যদি পছন্দ হয়, বর পছন্দ হয় না—নানান খুঁত বেরোয়। তিনটে পাস হলে চারটে পাস নয় কেন তার গবেষণা চলে। বরের বাড়ি থাকলে, গাড়ি নেই কেন তার সমালোচনা হয়।

এমনি ক'রে বাছতে বাছতে সুধার বয়েসই বেড়ে যেতে লাগল।

সুধা বেচারীর সে কী অবস্থা!

অনেক ক্ষেত্রে আবার মেয়ে পছন্দ হতো না।

একে কালো, তায় অস্বাভাবিক ভাল স্বাস্থ্য ছিল সুধার।

মুখশ্রীতে বড় কেউ ভুলতো না।

মেয়ের রঙটাই আসল, ভবিষ্যৎ বংশের কথা তো ভাবতে হবে—যদি অমন গুটি পাঁচ-সাত মেয়ে হয় তখন?

দেখতে যেমন তেমন হোক রঙটা কটা না হ'লে—

ধরাধরি ক'রলে হয়তো অনেক আগেই সুধার বিয়ে হতে পারতো।

কিন্তু পাঁচকড়িমামা নিজের আভিজাত্য ত্যাগ করেননি—বিনা পয়সায় তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন না। দস্তুর মত খরচপত্র ক'রবেন। তাঁর নীচু হওয়ার কি আছে। রঙ ধুয়ে খাক বেটারা। মেয়ে তাঁর ফেলনা নয়।

পাঁচকড়িমামা অনেক টাকা খরচ করেছিলেন সুধার বিয়েতে।

কিন্তু পাত্র যা মনোনীত করেছিলেন, সুকুমারের পছন্দ হয়নি।

রোগা, কালো কেমন যেন দেখতে সুধার বর। সুধার সঙ্গে মোটেই মানায়নি।

বরের বাপের পাঁচসাতখানা বাড়ি আছে কলকাতায়। লেখা-পড়া তেমন নয়।

হলে নিশ্চয়ই মেজকাকী সবাইকে বলতেন। বরের বাপের ঐশ্বর্যের কথাটা অনেক ক'রে প্রচার করেছিলেন। শুনতে খুব খারাপ লাগতো সুকুমারের, সুধার বিয়ে না-হওয়া পর্যন্ত রোজই শুনতে হতো একবার করে।

বংশের কথাও মেজকাকী বলতেন—খুব বনেদী, খুব নামী, খুব মানী।

যেমন দেরি করেছিলেন তেমনি সুখী হয়েছিলেন পাঁচকড়িমামা বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে।

হ্যাঁ, যোগ্য ঘরই পেয়েছিলেন।

বরের বাপের এত ঐশ্বর্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করার পর অতি বিনয় সহকারে তিনি বলেছিলেন, বনেদীর আঁস্তাকুড় ভাল। আজকালকার হা-ঘরের মতন নয়—ছেলে গোটাকতক পাস করলে হাঁ ক'রে থাকে, পেট মোটা কত। এত দাও ততো দাও…এদিকে বেটাদের পাশ ফেরবার জায়গা নেই।

যাই হোক, সেই একটা বিয়ে দেখেছিল সুকুমার মিত্তির বাড়ি।

গাড়ির ঘটা, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের ভিড়! কত যে 'তত্ত্ব' এসেছিল, নাম লিখে সুকুমারের হাত ব্যথা! প্রথমে সদরের ঐ উঠানে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, তারপর তুলে মাঝের বাড়ির ঐ প্রথম হলঘরটায় রাখা হয়েছিল।

তাই কি সব সামলান গিয়েছিল, সন্দেশগুলো কাদার মত তাল পাকিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সারা বাড়িময় একটা গা ঘিন-ঘিন অবস্থা ক'দিন ধরে।

তারপর বিয়ের দান-সামগ্রী! মাঝের বাড়ির উঠান ভর্তি! কোনো দোকানে এক সঙ্গে অত জিনিস দেখা যায় না। সে ফর্দও সুকুমার তৈরি করেছিল, একটা একসারসাইজ খাতা ভর্তি। কাঁসা-পিতল-সোনা-রূপো কোন ধাতুই বাদ ছিল না। একটা যজ্ঞের ব্যাপারে বুঝি সেকালের রাজ রাজড়ারা এমন খরচপত্র করতেন না।

দেখে শুনে কেমন একটা ভাব হয়েছিল সুকুমারের—অকারণে কেমন একটা মন ভার-ভার।

পাঁচকড়িমামার অবস্থার তুলনায় হয়তো এ কিছু নয়। টাকা থাকলেই এভাবে তার ক্ষয় করা উচিত নয়।

মনে পড়ছে সুকুমারের, অবস্থা বুঝে আগে থেকেই সে দেশ থেকে বাবাকে লৌকিকতা করতে বারণ ক'রে দিয়েছিল—পৈ পৈ ক'রে নিষেধ করেছিল, কেউ যেন না মেজকাকীর বাপের বাড়ি তাঁর ভাইঝির বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে আসে। ভিড় বাড়িয়ে কোন লাভ নেই, মান থাকবে না। যেমন একধারে সব আছে তেমনি থাক, বড়লোকদের সঙ্গে মাখামাখি ক'রে লাভ নেই। তাছাড়া ক'পয়সার জিনিস তাঁরা দিতে পারবেন। মেজকাকীর শ্বশুরবাড়ি বলে এঁদের আত্মীয়-স্বজন বেশী ক'রে খোঁজ ক'রবেন। লজ্জার একশেষ। না এলে, না দিলে বরং একরকম ক'রে ঢাকা দেওয়া যাবে।

মেজকাকীও বোধ হয় তাই চেয়েছিলেন।

একবারও তিনি ভুলে সুকুমারকে রসুলপুরের লোক-লৌকিকতার কথা জিজ্ঞেস করেননি। শ্বশুরকুলের অবস্থার কথা তাঁর জানা আছে—তার সাক্ষী সুকুমার।

সুধার বিয়ে হয়েছে এক যুগেরও বেশি; তখনই মীরার বিয়ের বয়স হ'য়ে গিয়েছিল।

সুকুমার শুনেছিল, প্রত্যেক মেয়ের জন্য ব্যাঙ্কে দশহাজার টাকা রেখে গিয়েছিলেন ভবতোষ মিত্তির—তাঁর মৃত্যুকালে পাঁচকড়িবাবুর পর-পর চারটি মেয়ে হ'য়েছিল। সুধা, মীরা, রেবা, রেখা। নাতির মুখ তিনি দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু নাতনীদের ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন অবস্থা বুঝে।

টাকা থাকলে মেয়ের বিয়ের ভাবনা কি বাঙালী হিন্দুর ঘরে!

কত কানা-খোঁড়া-বোবা-কালা উদ্ধার হয়ে যায় টাকার জোরে। পাঁচকড়িমামার তো টাকার অভাব নেই, তা হ'লে এতদিন তাঁর মেয়েদের বিয়ে হ'লো না কেন?

সুকুমার চুপ করে রইল।

মিত্তির বাড়ির উপযুক্ত পাত্র বোধ হয় তার সন্ধানে নেই।

পাঁচকড়িবাবু আলাপের সুরে বললেন, আজকাল আবার নতুন ঢেউ উঠেচে, মেয়ে লেখাপড়া জানে কি না! জানলেও আবার ক'টা পাস খোঁজ চাই। বিবিয়ানায় হ'লো না আবার মাস্টারী!—ঘরের বৌ বসে বসে রাতদিন নাটক-নভেল পড়বে, জুতো পায়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে! যে আসে গোড়া থেকে বলি, মেয়ে আমার জজ-ব্যারিস্টার নয়। পছন্দ হয় কথাবার্তা চলুক, দেখা-শোনা হোক, না হয়তো ঐখান থেকেই বিদায়! আবার শেষ পর্যন্ত যারা আসে সে-সব ঘরে কাজ ক'রতে ইচ্ছে করে না—চালচুলো নেই এমনি ঘর, অন্ত ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ! টাকার লোভ কেবল!

কি ভেবে সুকুমার বললে, দেখে-শুনে লেখাপড়া জানা, সচ্চরিত্র ছেলে খোঁজ করলে পারতেন!

পাঁচকড়িবাবু বললেন, সে তুমি কি বলবে, খোঁজ কি আর করিনি। ঐ লেখাপড়াই সম্বল, বৌ-ছেলেকে দু'দিন বসিয়ে খাওয়াবার ক্ষমতা নেই তাদের। শঙ্করদাদের তুমি তো চেন, ঐ গিরিশ মুখার্জি রোডে বাড়ি—আমাদেরই জ্ঞাতি, লেখাপড়া জানা ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আজো কি খোয়ারটা হ'চ্চে—মাস মাস মাসোহারা যোগাতে হচ্চে, কিনা ছেলে বিদ্বান শিক্ষিত!

এরপর আর কিছু করবার নেই ব'লেই যেন পাঁচকড়িবাবু মেয়েদের আর সম্বন্ধ করেন নি।

বিয়ের বয়েস ওদের বহুকাল গত হ'য়েছে।

আর বুঝি কোন আশা নেই।

কি আশ্বাস সুকুমার দেবে ভেবে পেল না।

অমন সুন্দর অমন রাশভারি পাঁচকড়িমামাও যেন কেমন হয়ে গেছেন।

পাঁচকড়িবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কটা বোন ছিল না! তাদের সব বিয়ে হ'য়ে গেছে?

সুকুমার মৃদু স্বরে বললে, হ্যাঁ।

বেশ! বেশ!

পাঁচকড়িবাবু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন, বেশ ভাল বিয়ে দিয়েচো সব!

সুকুমার বললে, ঐ এক রকম। খেতে পরতে পায়, রোজগারপাতি করে, স্বাস্থ্য ভাল—

তা হ'লে তো অনেক হ'লো! তাই কি পাওয়া যায় আজকাল!

পাঁচকড়িবাবু বেশ বিস্ময় প্রকাশ ক'রলেন, তোমার বাহাদুরি আছে!

মনে মনে ভাবলেও আজ কেমন বাধলো সুকুমারের বলতে—আপনাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা!

অত বাছাবাছি নেই, দেনা-পাওনার, দেওয়া-নেওয়ার অত কষাকষি নেই—মেয়ে পছন্দ হ'লেই হ'লো! ওরই মধ্যে অল্পস্বল্প যা হোক কিছু—

পাঁচকড়িবাবু বললেন, দেখো না চেষ্টা করে।

দেখবো। সুকুমার বললে।

মনে মনে সে নিশ্চিত জানে এ দেখায় পুরোন মিত্তির বাড়ির কারো মন উঠবে না। সেই ঘর পছন্দ হ'লে বর পছন্দ হবে না—বর পছন্দ হ'লে, ঘর পছন্দ হবে না। দেনাপাওনাও বনিবনা হবে না শেষ পর্যন্ত। আভি-জাত্যের, বড়মানুষীর এমন একটা মানসিকতা ক্রিয়া করবে যাতে শেষ পর্যন্ত অরক্ষণীয়া কন্যার মনোবেদনা এই তিন মহলা বাড়ির কোন এক নিভৃত কক্ষে গোপনে অশ্রুসংবরণ করবে! কন্যা পূর্বের মতই আবার হাসবে, খেলবে, উঠবে, হাঁটবে—কেউ কিছু টেরও পাবে না।

দোষ কারো নেই—উপযুক্ত পাত্র না পেলে এ বাড়ির দেউড়ি পার করে কার সঙ্গে মেয়ে পাঠাবেন? যার তার হাতে তো তা বলে মেয়ে দেওয়া যায় না! বংশ, মান, মর্যাদা, নাম!

সেই অশায় পাঁচকড়িবাবুর মেয়েগুলো আজো ভুলে আছে হয়তো। তাদের জন্যে বরের বাপ তপস্যা করছেন!

দোর গোড়ায় শব্দ হতে সুকুমার মুখে তুলে চাইলে।

সুধা যেন! সঙ্গে একজন কে—

সুধারও চোখ পড়েছিল সোজাসুজি।

চিনলেও না-চেনার ভান যেন তাকে করতেই হয়—স্বামীসহচারিণী যে!

সুকুমারও কোন কথা বললে না, কেমন সঙ্কোচ বোধ করলে।

তা ছাড়া সুধার সমভিব্যাহারী ভদ্রলোকটির সঙ্গে তার তেমন আলাপ পরিচয় ছিল না ইতিপূর্বে। প্রায় সুধার বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার এ বাড়ির সঙ্গ ছেড়েছে।

সে কি আজকের কথা, এক যুগেরও বেশি!

কিন্তু কাছে সরে এসে সুধাই সঙ্কোচের সব আবরণ ত্যাগ করে সেই কবেকার ছেলেমানুষী সুরে বললে, সুকুদা যে! কেমন চুপটি ক'রে বসে আছে দেখ! আমি মনে কার—

সুকুমার তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে সুধার স্বামীকে অভ্যর্থনা করলে, বসুন।

বিশ্বনাথ বসলে না। কেমন এক রকম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিক লক্ষ্য ক'রতে লাগল।

পাঁচকড়িবাবু জামাইকে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন, এস! কতক্ষণ এসেছো?

বিশ্বনাথ তেমনি নির্বাক।

সুকুমারকেই যেন তার যত সন্দেহ!

সুকুমার লক্ষ্য ক'রলে ভদ্রলোক যেন রেগেই আছেন, মুখ চোখ কেমন যেন রুক্ষ কঠিন।

সুধা আরো মোটা, আরো বিস্তৃত হয়েছে—পাকা গিন্নীবান্নি! আধ হাত চওড়া তাঁতের শাড়িটায় তাকে বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি ভারিক্কি দেখাচ্ছে। মুখটি কিন্তু তেমনি কচি-কচি। হীরের নাকছাবিটা জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রছে।

সুধা বললে, এর মধ্যে কত বড় হয়ে গেছ তুমি সুকুদা! চেনাই যায় না—

সুকুমার হাসবার চেষ্টা করলে—বয়েস তো কম হয়নি!

সুধা তেমনি তর্ক করে, ইস্‌-স্‌, কত যেন বয়েস—গাছ পাথর নেই!

সুকুমার বললে, তা অনেক হলো বইকি!

ভারি তো! আমার চেয়ে মোটে—সুধা হঠাৎ থেমে গেল।

বিশ্বনাথবাবুর ভ্রূটা অস্বাভাবিক বক্র যেন!

পাঁচকড়িবাবুকে বড় জামাই জিজ্ঞেস করলে, কেমন আছেন? শুনলুম হঠাৎ শরীর খারাপ হয়েছিল?

কুশল প্রশ্নে পাঁচকড়িবাবু আপ্যায়িত বোধ করলেন, ভাল! ওদের কাণ্ডটা দেখেচো?

নিজের মতে বিশ্বনাথ বললে, শুন্‌লুম খুব নাকি চোট লেগেছে—হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলেন!

না, না, কিছু হয়নি—কোথাও লাগেনি। বুড়ো হয়েছি, অমন একটু আধটু পা স্লিপ করবে বই কি! ও কিছু নয়! মীরার মেয়ের বিয়ে দেখলে?

সে পাঁচকড়িবাবুই নন জামাই-এর সামনে।

কেমন হলো?

বিশ্বনাথ বললে, কিছু না হলেই ভাল। খুব সাবধানে চলা ফেরা করবেন। সেদিন অমনি আমার এক মামা চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে টপ করে ডান পাটাই ভেঙে ফেললেন, আজো ভুগছেন—হাড় আর জোড়া লাগছে না।

বুড়ো হাড়! পাঁচকড়িবাবু বললেন।

বোধ হয় জামাইএর ইঙ্গিতটা বুঝতে পারেন।

সে রকম কিছু নয়!

সুধা একেবারে সুকুমারকে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

শাড়ির পাড়টা সুকুমারের হাতের কনুই স্পর্শ করেছে বোধ হয়। অদ্ভুত একটা ভাব হয় মুখের।

নিজে থেকে সুকুমার সরে যেতে পারে না। আবার সরে দাঁড়াবার কথা মুখে ফুটে বলতেও পারে না।

আত্মীয়া হলেও আজ সুধা পরস্ত্রী!

বিশ্বনাথবাবু লক্ষ্য ক'রলে কি মনে করবেন!

সুকুমার আড়ষ্ট হয়ে খালি চেয়ারটার সঙ্গে মিশে থাকতে চায়!

সুধা জিজ্ঞেস করলে, একলা এসেছো সুকুদা? বৌকে নিয়ে এলে না কেন?

সুকুমার মাথা নাড়লে।

ঠিক এই মুহূর্তে বলতে পারলে না, স্ত্রী তার অনেকদিন গত হ'য়েছে।

সুধা বললে, বৌকে একদিন নিয়ে এসো না। সেই কবে দেখেছিলুম—মনেই পড়ে না।

সুকুমার চুপ করে রইল।

যা সে মনে করেছিল, তা নয়—সুধা তেমনিই আছে। বড়লোকের মেয়ে থেকে বড়লোকের বৌ হয়েছে বলে তার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। স্বচ্ছল স্বামীর ঘরে যে অহঙ্কারটুকু মেয়েদের স্বাভাবিক তাও সুধার নেই।

বরং ভদ্রলোকই যেন—.

না, হয়তো ভুল হচ্ছে।

স্বামী ভাল না হলে স্ত্রী ভাল হয় কি ক'রে। বিশ্বনাথবাবুও ভাল লোক। নতুন দেখা, অপরিচয়ের সঙ্কোচ কি ক'রে ত্যাগ করবেন! তার ওপর বড়লোক—

সুধার কথা ফুরোতে চায় না।

বাপের অসুখ খেয়ালই নেই। যেন তাকে ঘরে একলা পেয়ে আলাপ ক'রছে—কতকাল পরে দেখা!

অসঙ্কোচে সুধা জিজ্ঞেস করলে, কি ছেলে-পুলে তোমার সুকুদা?

কি মুশকিল!

একে সুকুমার কি বলে থামাবে!

এখনি সুকুদা সম্বন্ধে সুধার সব কথা জানা চাই।

সুধা বললে, কি! ছেলেপুলে হয়নি? বেশ বৌ তো!

মনে মনে সুকুমার কৌতুক বোধ করে। আচ্ছা কৌতূহল সুধার এখনো। কে সুকুমার, তার জন্যে আজো এত মাথাব্যথা!

যদি কোনদিন এমনি হঠাৎ দেখা না হতো তা হ'লেও কি সুকুমারের কথা এমনি করেই সুধার মনে পড়তো—কোথায় গেল তাদের সুকুদা? আর কোনদিন কি দেখা হবে—দেখা হ'লে কি সেইসব কথা মনে পড়বে?

বড় জোড় দু'চার বছরের ছোট সুধা।

প্রথম যেদিন সুকুমার এ বাড়িতে আত্মীয়তার সূত্র ধরে আলাপ-পরিচয় ক'রতে আসে সেদিন সুধাকে ফ্রক পরতে দেখেছে। বেশ বড় মেয়ে তখন সুধা। বুক-কাটা ফ্রকটা বেমানান মনে হয়েছিল সুকুমারের। তাদের দেশের বাড়িতে ঐ বয়েসের মেয়েরা কাপড় পরে এঁটে-সেঁটে। যে জন্যেই হোক মেয়েটিকে দেখে সুকুমার সেদিন বড় লজ্জা পেয়েছিল—তার পাড়াগেঁয়ে রুচিতে বেধেছিল। তারপর অবশ্য নিত্য আসাযাওয়ায় সব সহ্য হ'য়ে গিয়েছিল। ক'দিন পরে সুধা যখন শাড়ি পরতে আরম্ভ ক'রলে, সুকুমারই রহস্য করলে, এরি মধ্যে গিন্নীবান্নি হবার শখ! দেখ, দেখ, কাকীমা সুধার কাণ্ড দেখ!

তারপর কবে যেন সঙ্কোচের সব বেড়া সরে গিয়েছিল।

কোন কারণে একদিন না এলে কত কৈফিয়ৎ সুকুমারকে দিতে হ'তো সুধার কাছে।

সুকুমারকে কি যে পেয়েছিল পাঁচকড়িবাবুর মেয়েরা—আত্মীয়, ভাই, বন্ধু, সাথী!

সুকুমারও মিশেছিল অবাধে—মামাবাড়ির আশ্রয় থেকে দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার নফর কুণ্ডু রোডের বাড়িতে ছুটে আসতো। কলেজ পালিয়ে কতদিন দুপুর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাটিয়ে গেছে পাঁচকড়িমামার বাড়িতে!

কিসের লোভে?

শুধু কি মেজোকাকীর ভালবাসা, না আর কিছু?

মেয়েগুলো যে তাকে টানতো। কত খেলা হ'তো ভিতর-বাড়ির ঐ চিলে কোঠায়!

কতদিন সুকুমার চুপচাপ শুয়ে থাকতো। সুধা, মীরা, রেবা, রেখা তার কত সেবা করতো—কত ঝগড়া, মান-অভিমান বোনেদের মধ্যে তাকে নিয়ে। সুধার পরিচর্যাটা বুঝি সব থেকে আন্তরিক। বোনেদের সঙ্গে ও বড় একটা মুখোমুখি ঝগড়া বা রাগ করতো না। কিন্তু সত্যিকারের অভিমান যখন করতো, সুকুমার ব্যস্ত হয়ে পড়তো—জানতো এ অভিমান দুটো স্তোক-বাক্যে শান্ত হবে না।

বড় অভিমানিনী ছিল সুধা সবার চেয়ে!

নফর কুণ্ডু রোডের এই বিরাট তিন-মহলা বাড়িটার অন্তঃপুরে একদিন ছেলেখেলায় মান-অভিমানের কি যে মোহ সৃষ্টি হয়েছিল; ভাবলে বুঝি আজো রোমাঞ্চ হয় সুকুমারের। বড়লোকের অতগুলো মেয়ে কি ভালটাই না তাকে বাসতো! সুকুদা-অন্ত প্রাণ ছিল তাদের। যেন নারীজন্মের মর্যাদা তারা সুকুমারের কাছেই প্রথম পেয়েছিল।

পর পর পাঁচটি মেয়ে হ'য়েছিল বলে পাঁচকড়িমামার বাড়িতে মনস্তাপের অদৃশ্য একটা ছায়া ছিল।

পয়সা থাকলে কি হবে, পাঁচটা মেয়েতেই খেয়েছে! অত সুন্দরী লীলাবতী, তাঁরও যেন তেমন খাতির ছিল না পাঁচকড়িমামার কাছে।

দুধে-আলতা রঙ সময় সময় কত ম্লান মনে হতো।

সিন্ধুবাসিনীও আক্ষেপ ক'রতেন যখন-তখন: একটা ছেলে হ'তে নেই, সব কটা মেয়ে!

তা বলে ভাইঝিদের ভালবাসতে তিনি কসুর ক'রতেন না—তাদের সব আবদার, আহ্লাদ তিনিই সহ্য ক'রতেন। কোন অনাদর বা অবহেলা প্রকাশ পেত না তাঁর ব্যবহারে। মুখে, মনে সিন্ধুবাসিনীর অদ্ভুত একটা দ্বন্দ্ব ছিল ভাইঝিদের নিয়ে!

সুকুমার বুঝি একদিন তাদের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়ে মনস্তাপের সে ছায়াটাকে দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। মেয়েদের সব কিছুর ভার একদিন সিন্ধুবাসিনী স্বচ্ছন্দে তার উপর দিয়েছিল।

এ বাড়ির ঝি-বৌ কারো অন্তঃপুরের চৌকাঠ পার হবার হুকুম ছিল না। নেহাৎ কোথাও যাবার দরকার হ'লে ঘরের গাড়িতে গুড়ের নাগরির মত ঠাসাঠাসি হ'য়ে রক্ষী সঙ্গে যেতে হয়। সাধারণ যানবাহনে বা হেঁটে কোথাও যাবার কথা কেউ কল্পনাই ক'রতে পারে না।

ক্রমে সুকুমার এতই বিশ্বাসী এবং প্রভাবশালী হ'য়ে উঠেছিল যে, পাঁচকড়ি-মামার মেয়েগুলোকে একদিন বিধিনিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে সঙ্গে ক'রে হাঁটিয়ে বায়স্কোপ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল চড়কডাঙার মোড় থেকে!

দোষ ছিল। কিন্তু সুকুমারের জন্যে সে-দোষ পুরোন মিত্তির বাড়িকে স্পর্শ করেনি।

আজকাল সবাই যাওয়ার প্রশ্ন নয়, সুকুমার সঙ্গে যখন ছিল তখন—

সিন্ধুবাসিনী ঐ একটি দিনের জন্যে অনুমোদন করেছিলেন।

কিন্তু যেদিন ওরা প্রথম বাইরে এল সে কী কাণ্ড!

পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়ে যায় আর কি!

রাস্তাঘাটের কত পরিবর্তন হ'য়ে গেছে। পা পা ক'রে হাঁটতে বুঝি ওদের খুব মজা লেগেছিল—চিলেকোঠার ছাদের ওপর থেকে দেখা জগতটার সঙ্গে সিমেণ্ট-পীচের কঠিন এই জগতের যেন কোন মিল নেই।

এ কোথায় আনলে সুকুদা? যাও!

সব চেয়ে সুধাই সেদিন ভয় পেয়েছিল বেশি!

তারপর কতদিন সেই পায়ে-হাঁটা জগত নিয়ে মেয়েরা সুকুমারকে প্রশ্ন করেছে।

রাস্তা কি করে হয়? পুকুর কেন বুজোয়? অত খোয়া কোথায় পায়? কারা রাস্তা করে? কি লাভ আছে রাস্তা করে? শঙ্কর জ্যাঠাদের বাড়ির রাস্তাটা কোন্ দিকে? নরেশ দাদুর বাড়ি কদ্দূর? সেখানেও অমনি পীচের রাস্তা হ'য়ে গেছে?

আবোল-তাবোল আরো কত কি।

আর অবশ্য সুকুমার কোনদিন পাঁচকড়িমামার মেয়েদের রাস্তায় নিয়ে বেরোবার ঝুঁকি নেয়নি।

সিন্ধুবাসিনী অনুমতি দিলেও সে রাজী হয়নি—দরকার কি মিত্তির বাড়ির প্রথাবিরুদ্ধ কাজ করে!

ওদের গাড়ি আছে, জুড়ি আছে, শুধু শুধু হাঁটবে কেন? ছি!

সিন্ধুবাসিনী প্রায় বলতেন, একটা চটি পায়ে দিয়ে ফট্-ফট্ ক'রে রাস্তায় বেরোলেই অমনি হ'ল! এ-বাড়িতে ওসব সস্তা বিবিয়ানা কোনকালে হবে না।

পাঁচকড়িমামার বাবা বলতেন, তাঁর বাড়ির বৌ-ঝিরা যেন বাসে-ট্রামে কখনো না চড়ে, কি, জুতো পায়ে দিয়ে রাস্তায় না বেরোয়। যেদিন বেরোবে সেদিন—

এখনো বোধ হয় সেই নিয়মই আছে।

সুধার শ্বশুরবাড়িতেও বোধ হয় তাই।

পর্দা না থাক, পর্দার পিছনের সবটুকু প্রথা বজায় আছে অন্তঃপুরিকাদের জন্যে। আপন বৃত্ত ছাড়া কোথাও যাবার উপায় নেই—

হয়তো সুকুমার চেনা-শোনা আর এবাড়ির আত্মীয় বলে, সুধার স্বামী সুধাকে এত কথা কইতে দিচ্ছেন। মনে করলেও মুখে কিছু বলছেন না। সুকুমার শুনেছিল, ওঁরাও কম রক্ষণশীল নন।

আলাপরতা সুধার হীরের নাকছাবিতে এখন যেটুকু আলো ঠিক্‌রোচ্ছে তার সিকির সিকি বুঝি ওর শ্বশুরবাড়ির অন্তঃপুরে কোনদিন ঠিক্‌রোয় না। অত বড় বাড়ির আষ্টেপৃষ্ঠে নাকি পর্দার ঘেরাটোপ দেওয়া—অসূর্যম্পশ্যা সে বাড়ির বৌরা!

সে তুলনায় সুধা তো এখন অনেক স্বাধীন হয়েছে।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে বরং সুকুমারকেই অপ্রস্তুত ক'রে দিচ্ছে।

গম্ভীরভাবে বিশ্বনাথ বললে, তা হ'লেও সাবধান হ'তে হবে। কত রকমে কি হ'তে পারে আজকাল তার ঠিক কি!

সুধার এদিকে খেয়াল নেই।

সুকুমারকে নিয়ে পড়েছে।

সুধা বললে, বৌকে একদিন আননা, দেখি। বল আনবে? আমাদের কথা তোমার একেবারে মনে নেই—ভুলে গেছ! বিয়ে করে কি যে হয়েচো তুমি সুকুদা! জগতে বিয়ে কি আর কেউ করে না? তোমার মত কেউ না! আমাদের দেখ দেখি!

সুকুমার চুপ করে রইল।

কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। কে জানে সুধার মনোগত ইচ্ছেটা কি!

বিশ্বনাথ শ্বশুরকে কি বলতে যাচ্ছিল, দোরগোড়ায় সিন্ধুবাসিনী এসে ডাকলেন, এস বাবা! খাবার দেওয়া হয়েচে, মেয়েরা বসে আছে।

বিশ্বনাথ অশেষবিধ আপত্তি ক'রলে।

কোন মতে না-খাবার অজুহাত দেখালে—শ্বশুরালয়ে যাত্রা করবার পূর্বেই সে উদরপূরণ ক'রে এসেছে ইত্যাদি।

সিন্ধুবাসিনী কোন ওজর-আপত্তি শুনলেন না।

এগিয়ে এসে জামাইএর হাত ধরলেন, তা কি হয়। কিছু না খাও, একবার ব'সে উঠে আসবে—তুমি বাড়ির বড়! মেয়েরা কত আশা করে আছে! এস বাবা।

এক রকম পাকড়াও ক'রে সিন্ধুবাসিনী জামাইকে নিয়ে যান।

হঠাৎ সুকুমার মনে মনে কেমন ক্ষুণ্ণ না হ'য়ে পারে না।

অনেকদিন পরে এ বাড়িতে সে এসেছে, তাও নিজে থেকে আসেনি—ঐ আপ্যায়নটা পাওয়া তারই উচিত ছিল—কম বড় আত্মীয় নয় সে এ বাড়ির।

অন্তত মেজোকাকীর সে কথা মনে রাখা উচিত! কি ভেবেছেন, সেই সুকুমার আছে না কি আজো?

তাছাড়া এমন কোন স্বার্থের সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে।

আজ নেহাৎ-ই কুটুম সে!

খানিক পরে পাঁচকড়িবাবু বললেন, সুধা, সুকুমারকে নিয়ে যা, ও বেচারী সেই থেকে এখানে মুখটি বুজিয়ে বসে আছে। নাই বা তোরা নেমন্তন্ন করলি আগে থেকে, এসেছে মনে করে…কত আনন্দের কথা…নিয়ে যা…খাতির কর…খাওয়া!

মনের কথাটা যেন পাঁচকড়িবাবু ধরতে পেরেছেন।

বড় অপ্রস্তুত বোধ করে সুকুমার।

ব্যস্ত হ'য়ে বলে, না, আমি কিছু খাব না,…বাড়িতে বলে আসিনি…

এতে নেমন্তন্নর কি আছে ? পুতুলের বিয়ের আবার লৌকিকতা কি ? থাক, থাক !

সুধা বোনেদের ওপর রাগ ক'রে বাপকে বললে, তোমার মেয়েগুলো যেন কি ! যত বয়স হচ্ছে আক্কেল-বিবেচনা লোপ পাচ্ছে ! সুকুদার কথা আমি মনে করবো, না, ওরা মনে করবে ? কোনদিকে যদি লক্ষ্য থাকে এতটুকু ! অত বড়-বড় মেয়ে সব। কেবল হৈ হৈ করচে।

পাঁচকড়িবাবু মেয়েদের হ'য়ে বড় মেয়ের তিরস্কার গায়ে পেতে নিলেন। বললেন, যাক গে, তুই দেখ মা…তোর পিসিও হয়েচেন তেমনি। সুকুমার তুমি যাও !

সুকুমার লজ্জায় একশেষ।

সত্যিকারের খেতে আসেনি সে এতদিন পরে।

খাওয়া নিয়ে এত কাণ্ড হবে সে ভাবতে পারেনি। আর বললেই বা সে খাবে কেন রবাহুত হ'য়ে।

পাঁচকড়িমামার উপর সুকুমারের করুণা হয়—কি ছিলেন, কি হয়েছেন। এসব তুচ্ছ ব্যাপারও আজকাল লক্ষ্য ক'রছেন—কে এল, কে গেল, কে খেল, কে না খেল !

সুকুমার বললে, আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন ! ওরা কি সামান্য আয়োজন করেছে তার মধ্যে আমাকে—আর একদিন বরং এসে খাওয়া যাবে।

সুধা মুখ ঘোরাতে আবার নাকছাবিটা জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠল।

আসল হীরা, বনেদী বড়লোক না হ'লে অমন জিনিস কেউ সংগ্রহ করতে পারে না। মুখ ফিরিয়ে সুধা বললে, তুমি থাম তো সুকুদা—বড্ড ওদের হ'য়ে বলচো ! এস আমার সঙ্গে…

আর কোন আপত্তি সুকুমারের খাটে না।

সেই সুধা যখন অমন ক'রে বলছে তখন।

সুধার বলার মধ্যে আজো কেমন একটা জোর আছে। কিছুতেই সুকুমার না করতে পারবে না।

কিন্তু সুধার সেই এক কথা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, গা ছুঁয়ে বল, তোমার বৌকে একদিন নিয়ে আসবে!

সিঁড়ির বাঁকটায় আলোটা কেমন যেন অস্পষ্ট আর ছায়া-ছায়া।

ধাপটা এখানে একটু চওড়া, দু'জনে নেমে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে।

খানিক বুঝি থমকে থাকে উভয়েই।

সুকুমার বললে, আজ কেবল বৌ দেখার কথা বলচিস কেন বল্ দিকি? কেন, তোর নিজের কথা কিছু নেই!

বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠে সুধা বললে, আমার কথা! কেন, আমার কথাটিকে দেখলে না এতক্ষণ। আর কি কথা শুনতে চাও?

অন্যমনস্ক হ'য়ে সুকুমার বললে, তোর বৌদি আছে যে তাকে দেখবি!

তার মানে? সুধার গলা যেন কাঁপে।

সুকুমার ধীর কণ্ঠে বললে, সে তো অনেকদিন মারা গেছে—বিয়ের পরেই!

সুধা জিজ্ঞেস ক'রলে, কি হ'য়েছিল?

এ্যক্লামসিয়া। সিঁড়ির নীচে পা দিয়ে সুকুমার বললে।

সুধাও পিছন পিছন নামলে।

এতক্ষণ খুব একটা অপরাধ যেন সে করছিল না জেনে-শুনে। সুকুদা মৃতদার, ভাবতে তার বড় খারাপ লাগে। তারা তো দিব্যি বেঁচে আছে, সুকুদার বৌটা মরলে কেন? কি চাপা সুকুদা, এতক্ষণ কিছু বলেনি।

সিঁড়ির তলায় এসে আবার দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়াল।

খানিকটা সময় নীরবে কেটে গেল।

দু'জনের মনে অনেক প্রশ্ন যেন ওঠানামা ক'রলে।

সুধা জিজ্ঞেস ক'রলে, আর বিয়ে করনি?

সুকুমার কৌতুক ক'রলে, কি মনে হয়?

অস্থির সুরে সুধা বললে, কি আবার মনে হবে। বল না—

সুকুমার বললে, মেয়ে কোথায় যে বিয়ে ক'রবো?...সবাই তো আর তোর বৌদির বাপের মত নয়, কিছু না দেখে-শুনে জামাই করবে। তার ওপর দোজবরে।

সুধা কি ভাবলে, কোন কথা বললে না।

সুকুমার তেমনি কৌতুক করলে, দেখিস না একটা মেয়ে বড়-সড় দেখে। আছে তোর হাতে?

সুধা সামনে এগিয়ে বললে, আমার দায় পড়েছে। তোমার বৌ তুমি খুঁজে নিও।

খুঁজে খুঁজে পাই না যে। সুকুমার হাসলে।

মাথার চুলগুলো সব পড়ে গেচে, এবার দাঁতগুলো পড়ে যাক। তারপর ধীরে-সুস্থে খুঁজো। আদিখ্যেতা!

সত্যি যেন রেগেই গেছে সুধা।

গম্ভীরভাবে সুকুমার বললে, বিয়ে করে আর কি হবে।...এই বেশ আছি, কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

পুরুষগুলোই অমন স্বার্থপর। তেমনি রাগ ক'রে সুধা বললে, যখন আর কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না, তখন বিয়ে-বিয়ে ক'রে পাগল হ'য়ে যায়।

হঠাৎ সুকুমার প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, আমার বিয়ে নিয়ে এতদিন পরে তোর এত ভাবনা কেন বল দিকি? দুনিয়ার কত লোক তো বিয়ে করচে না।

জানি না। আমার ভাবতে বয়ে গেছে। গলার স্বরটা সুধার কেমন যেন বিকৃত শোনায়, তুমি বিয়ে করে আমাদের রাজা করবে।

ব্যাপারটা সুকুমার ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

তার বিয়ে নিয়ে সুধা হঠাৎ এত ক্ষেপে গেল কেন।

অপরাধ সে কি ক'রেছে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ না করে?

আপসের সুরে সুকুমার বললে, এইবার একটা বিয়ে করবো দেখিস—

সুধা কোন সাড়া ক'রলে না।

তারপর নিজেকে শুনিয়ে সুকুমার বললে, এই বয়েসে লোকে বিয়ে করে, না? বল্—

রেগে-রেগে সুধা শেষ পর্যন্ত হেসেই ফেললে—আমাকে জিজ্ঞেস করচো কেন? তোমার খুশি।

সুকুমার বললে, নিজের খুশিতে কি সব সময় সব জিনিস হয়?

সুধা কোন উত্তর দিলে না।

হয়তো সুকুমারেরর মত ক'রে তার মনে পড়ছে না। পড়লেও আজ তাকে মনে আমল দেবার কোন কারণ নেই।

'খুশির' কথা সুধা কবে ভুলে গেছে। তাছাড়া সুকুমারও তো ভুলে গিয়েছিল।

সুকুমার বললে, কেউ যখন আমাকে আবার বিয়ে করার কথা বলে, কি মনে হয় জানিস? মনে হয়, সত্যি কি আমার বিয়ে করার যোগ্যতা আছে!

ইঙ্গিতটা সুধা বুঝতে পারে কি না কে জানে, চুপ ক'রে থাকে।

সুকুমার বললে, বিয়ে ক'রলে খাওয়াবো কি? বলে আপনি পায় না শুতে—

সুধা বুঝি আর সামলাতে পারে না, চোখ দুটো তার ধ্বক্ করে' জ্বলে ওঠে: এখনো যদি নিজেকে তুমি তাই মনে কর তা হ'লে সত্যি তোমার বিয়ে ক'রে কাজ নেই সুকুদা। ও বয়েসে আর কেউ তোমাকে আদ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দেবে না।

যদি রাজত্ব আর রাজকন্যা, কোনটাই না চাই তাহলে? পরিহাস ছলে আঘাতটা সামলে নিয়ে সুকুমার বললে, কেবল একটি মেয়ে, শাঁখা-শাড়ি-সিঁদুর!

তা-ও তুমি চাও না। অভিমান ক'রে নিজেই কেবল কষ্ট পাবে। সুধা গলিপথটার মুখ ছেড়ে অন্দর-মহলের উন্মুক্ত চত্বরে এসে পড়ল।

হঠাৎ সুকুমার থ হ'য়ে গেল, কি জবাব দেবে ভেবে পেল না।

সে কোনদিন ভাবতেও পারেনি সুধার মত আধুনিক কালের আলোক-বঞ্চিতা মেয়েরা এমন কথা কখনো বলতে পারে।

সেদিন এই নিভৃত পথটা বোধ হয় সুকুমারের অকারণ মনোবেদনার একমাত্র সাক্ষী ছিল—বাইরের ঘরে সুধার প্যাকাদেখা পর্ব শেষ হ'য়ে গেছে, কথা একরকম পাকা হ'য়ে গেছে। আগামী মাসের ১৬ই সুধার বিয়ে—উপযুক্ত ঘরেই পাঁচকড়িমামা মেয়ের সম্বন্ধ ক'রেছেন। তাঁর কালো মেয়ে ব'লে কিছু আটকে যায়নি। কলকাতায় কোন মস্ত বড় বনেদী বংশের ছেলে সুধার ভাবী স্বামী।

সেদিন একা একা প্রায়ান্ধকার পথটার ওপর দাঁড়িয়ে সুকুমার সুধার ভাবী শ্বশুরঘরের অশেষ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আলোচনা শুনতে পেয়েছিল। মেজোকাকীর গলাটাই যেন সব চেয়ে উচ্চ ছিল। সুধার আমার বরাত ভাল, তাই অত বড় ঘরে পড়ল। এমনি শিবপূজো করেনি। দাদা কেবল হাঁপাহাঁপি করছিল—ঐ বেয়লার সেনেদের সঙ্গে কাজ করি, কি না ছেলে চারটে পাস—এদিকে চালচুলো নেই। পাস ধুয়ে মেয়ে তোমার জল খাবে! এ কেমন হ'লো। মেয়ে রাজরাণী হ'লো।

সে আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ সুধার খোঁজ পড়ল।

সুধা গেল কোথায়?

কে যেন বললে, বাইরের ঘরের শ্বশুরকে দেখচে উঁকি মেরে।

একটা হাসির সাড়া পড়ল।

সত্যি, সুধা কিন্তু সেখানে ছিল না।

মেজোকাকী আর খোঁজ করলেন না। ভাইঝির শ্বশুরঘরের ঐশ্বর্যের বর্ণনা ক'রতে লাগলেন—মেয়ের বিয়েতে লেখাপড়ার চেয়ে পয়সাটা যে অধিকতর

বাঞ্ছনীয় সবিস্তারে তার ব্যাখ্যানা ক'রতে লাগলেন। তিনচারটে পাস আজকাল যদো-মোদো করছে। পয়সা বলতে যা বোঝায়, কটা লোকের আছে ?

সুধার শ্বশুরের পয়সা নর্দামা দিয়ে অমন কত গড়িয়ে যায়।

এই মেজোকাকী !

সুকুমার বৃথাই তা হ'লে বি-এ পাশ ক'রেছে।

যতদিন না তার বাবার পয়সা নর্দামা দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে ততদিন তার স্বোপার্জিত বিদ্যার কোন মূল্যই নেই। মিথ্যে ভেবে সে আজকের দিনে এমন দুঃখ পাচ্ছে। বেশ তো পেটপুরে খেয়েছে-দেয়েছে, আর কি প্রত্যাশা তার ?

সদরঘর থেকে চুরি-করা পাকাদেখার সিগারেটটা ফুরিয়ে গেছে।

হঠাৎ সুকুমার চমকে উঠলো।

ঠিক পাশটিতে এসে সুধা কখন দাঁড়িয়েছে—যেমন বেশে খানিক আগে ওর পাকাদেখা শেষ হ'য়েছে—বেনারসী, ব্রোকেড্, জড়োয়া নেকলেস, মুক্তোর সাতনরী কণ্ঠি, হীরের দুল। কপালের ঘামে চর্চিত চন্দন মুছে গেছে —মুক্ত কেশভার কেবল শিথিল কবরীতে আবদ্ধ।

সুকুমার বুঝি চোখ তুলে চাইতে পারে না।

কেমন চোখ জ্বালা করে। এত কুৎসিত বুঝি সুধা কোনদিন ছিল না। কী বিশ্রী আর জবড়জং দেখাচ্ছে !

হেসে কাছ ঘেঁষে এসে সুধা বললে, তাই বলি সুকুদা এর মধ্যে গেল কোথায়। লুকিয়ে লুকিয়ে—

সুকুমার যেন পাথর হ'য়ে গেছে।

কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল ঠায়।

সুধা বললে, তিনটে পাস করেও তোমার ভয় ?

হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে আসে, সুকুমার বললে, না। শুধু শুধু ভয় করবে কেন।

বিস্মিত কণ্ঠে সুধা বললে, তবে ? এমনি পালিয়ে এসেচো কেন ?

কঠিন স্বরে সুকুমার বললে, কে বললে পালিয়ে এসেচি ?

সুধা আর কোন কথা বললে না, বেনারসীর আঁচলটা নিয়ে পাকাতে লাগল।

সত্যিই হয়তো সেদিন সুকুমার বৃথা অভিমান করেছিল। সুধা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল।

কিন্তু আজকের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। সুধা এমনি বলেছে। সুকুমার যেন সত্যি কিছু মনে না করে।

কোমল সুরে সুধা বললে, রাগ ক'রলে সুকুদা ? পাগলের মত কি বলেচি—

নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠে সুকুমার বললে, সময় সময় পাগলেও সত্যি কথা বলে।

তাই নাকি।

মুখ ঘুরিয়ে সুধা হেসে ফেললে।

নাকছাবিটা চিক্‌চিক্ করে উঠলো—ঐ কত দূরে একটা আলো জ্বলেছে।

তা বলে পাগল ভেব না সত্যি ?

অদূরে মীরাকে আসতে দেখে সুকুমার কোন উত্তর দিলে না।

মীরা কেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিকে চেয়ে আছে।

সুধা মীরাকে নিয়ে পড়ল : কি মেয়েরে তুই মেজকী—সুকুদাকেই বাদ। একটু যদি তোর খেয়াল থাকে, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিস কোথায় পাঁচজনকে ডাকবি, বলবি, তা নয়—

মীরা ছাড়বে কেন, বললে, সুকুদা আমাদের কত খোঁজ রাখেন—ডাকলে যেন ওঁকে আজকাল কত পাওয়া যায়। সেই ভাগ্যি আমি করেচি ! সে তুমি

বলতে পার—বিয়ের দিন পর্যন্ত কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে সুকুদা কি খাটুনিটাই না খাটলে। আমরা কে যে আমাদের জন্যে ওর ঘুম হবে না।

বোনে বোনে সুকুমারকে নিয়ে এ ঝগড়া আগেও হ'য়েছে। সুকুমারই মিটিয়ে দিয়েছে। আজ যেন আর শোভা পায় না। তখনকার মানে আর এখনকার মানে বুঝি এক নয়।

সুকুমার বললে, চল, আর ঝগড়া করতে হবে না—আমি নিজেই যাচ্ছি। বল তোমার মেয়ের জন্যে কি ক'রতে হবে?

মীরা ঠোঁট উল্টে বললে, কিছু না। যাদের সুকুদা নেই তাদের মেয়ের বিয়ে হয় না!

এত বয়সেও মীরার তেমনি অভিমান আছে। তেমনি ঠোক্কর দিয়ে কথা বলে।

সুধা ধমক দিলে: ওকি রে মেজকী।—ওকি কথার ছিরি? দিন দিন কি যে হচ্ছিস তুই—যাকে যা নয় তাই?

মীরা পিছন ফিরে বললে, বেশ। তোমরা তো ভাল। আমার আর ভাল হ'য়ে কাজ নেই।

সুকুমারই অপ্রস্তুত হয় বেশি।

মীরা, শোন, শোন। রাগ করো না।

মীরা মুখ ফেরালে।

এতদিন পরে কুমারী মেয়ের দৃষ্টির এতটা আবিলতা বুঝি সুকুমার আশা করেনি। সামান্য কথার আঘাতে চোখ-মুখের ওকি অবস্থা হয়েছে মীরার। অনেক বড় দেখাচ্ছে ওকে সুধার চেয়ে। অথচ মীরাই ছিল পাঁচকড়ি-মামার সব মেয়েদের চেয়ে সুন্দর—মাজা-মাজা রঙ-এ ভারি বাহার ছিল মুখচোখের।

সেই মীরা!

সুকুমার কাছে এসে বললে, তোমার দিদির কথা শোন কেন। তোমার বলে মাথার ঠিক নেই—

সান্ত্বনা পেয়ে মীরা বুঝি হাসলে। বললে, বলতো সুকুদা। একে এই, তার ওপর বাবার অমন শরীর খারাপ। উনি তো এলেন নেমন্তন্ন রক্ষে করতে।

সুধা কি যেন ইঙ্গিত করলে সুকুমারকে।

মীরা লক্ষ্য করলে না। রান্না-বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত প্রায় দশটার সময় সদর রাস্তায় বেরতে কেমন যেন চোখে ধাঁধাঁ লাগল সুকুমারের। এতক্ষণ যেন আর এক জগতে গিয়ে পড়েছিল সে। স্মৃতি-বিস্মৃতিতে জড়ান অদ্ভুত। এই নফর কুণ্ডু রোডের কত পরিবর্তন হয়েছে, কত নতুন-নতুন বাড়িঘর উঠেছে—রাস্তার দুধারেই এখন বিজলী আলো রাতকে দিন ক'রে রেখেছে।

পাঁচকড়িমামার বাড়িটা কিন্তু ঠিক ভাবে আছে।

বাইরে বেরিয়ে এখন মনে হচ্ছে, বড় বেশি আলো চারিদিকে। সে তুলনায় পুরোন মিত্তির বাড়ির বিজলী আলোগুলোর তেমন জোর নেই। মানুষ-গুলোরও সে জলুস নেই।

আর কিছুতে এত বিস্মিত যেন সুকুমার আর কখনো হয়নি। অত বড় বাড়ির ওকি দশা হয়েছে!

পাঁচকড়িমামার ওপরই সুকুমারের রাগ হয় বেশি। বিবেচনা শক্তি কি ভদ্রলোকের একেবারে লোপ পেয়েছে—কি বলে বাড়িতে অত বড় বড় মেয়ে পুষে রেখেছেন?

এদিকে পান-ভোজনের ব্যবস্থাটা তো ঠিক আছে। মেয়েগুলোর দিকে

চোখ তুলে চাওয়া যায় না। কি করলেন পাঁচকড়িমামা এতদিন? সব কটিই মাথায়-মাথায়, গলায়-গলায়। আশ্চর্য, খেয়ালই করেননি পাঁচকড়ি-মামা। কি মতলব, কে জানে?

নফর কুণ্ডু রোড রাত দশটায় রম্‌রম্ করছে।

আগের দিন হ'লে কখন নিস্তব্ধ হ'য়ে যেত। সুকুমারই ভয় পেত মামার বাড়ি ফিরে যেতে।

আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে বেরিয়ে সুকুমার কতদিন থেমে-থেমে পথ চলেছে—নতুন পীচের রাস্তায় পা জড়িয়ে গেছে। তবু কোনদিন পাঁচকড়ি-মামার বাড়িতে রাত কাটাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেনি। মেয়েগুলো কত পীড়াপীড়ি করেছে। সিন্ধুবাসিনীও বলেছেন, থাক্ না...এই রাত্তিরে নাই বা গেলি!

সুকুমারের শোনা আছে পাতালপুরে অনেক ঐশ্বর্য, কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা কেমন যেন—সুখদুঃখ, আনন্দ-ভালবাসার বোধ তাদের ভিন্ন। পাঁচকড়িমামার বাড়িটা আজ যেন তেমনি—পূর্বের মত বিস্ময় বোধ করে না সুকুমার।

অজানা দুঃখে মন ভরে ওঠে। বোধ হয় অকারণ—

খেয়ে উঠে হাত ধুতে যাবার সময় মীরা পিছন পিছন এগিয়ে এল।

কলঘরের আলোটা জেলে দিয়ে বললে, সাবধানে পা ফেল, বড় পিছল... দাঁড়াও আমি হাতে জল ঢেলে দিই।

তারপর এগিয়ে এসে হাতে জল ঢেলে দিয়ে তোয়ালেটা বাড়িয়ে ধরে কেমন করে যেন খানিক সুকুমারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল মীরা।

সুকুমার জিজ্ঞেস করলে, কি দেখ্‌ছিস অমন ক'রে বল্‌তো?

মীরা উত্তর দিলে না, হাতের পান দুটো এগিয়ে দিলে।

সুকুমার বললে, আমি পান খাই কখনো! ভুলে গেছিস—

অন্যমনস্কের মত মীরা বললে, ও, দাঁড়াও মশলা আনি তা হলে!

না থাক, দরকার নেই, সুকুমার বললে।

আবার রান্নাবাড়িতে ফিরে এসে মীরা বললে, বৌদিকে এক দিন নিয়ে এসো না সুকুদা···কতদিন দেখিনি!

সুকুমার বললে, কেন আমাকে দেখে হলো না···আবার বৌদিকে দেখা চাই।

মীরা অনুরোধ করলে, সত্যি এনো না, একদিন।

সুকুমার মীরাকে মিছে কথা বলে এসেছে—বৌকে একদিন সঙ্গে ক'রে আনবার কথা দিয়েছে।

নতুন করে পাঁচকড়িমামার পাঁচ মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।

মেয়েরা আগে থেকেই সুকুমারের বৌ-এর সুখ্যাতি করেছে—তা বলে বৌদি তোমার মত নয়।—খুব ভালো বৌদি!

কেন জানি না, সুধাকে যে কথাটা সুকুমার অকপটে বলতে পারলে, মীরা বা তার আর কোন বোনকে সে-কথা বলতে পারলে না। অথচ সম্বন্ধ তার সবার সঙ্গে সমান। কেন যে এমন ব্যবহার সুকুমার করলে ভেবে পায় না। কুমারী মেয়েদের কাছে স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদটা দিতে সুকুমারের বাধলো কেন।

কোন মানে হয় না এ কপটতার।

মীরা, রেবা, রেখা, শান্তা, সিপ্রা।

যেন অনেক পুরোন পাঁচটা থাম সেকেলে বাড়ির—স্থানুর মত স্থির, অচঞ্চল। শোভা যা পোশাক-পরিচ্ছদের।

রাস্তাটা ছোট ক'রতে সুকুমার নফর কুণ্ডু রোডের পূব মাথার বাঁকটায় এসে ডানদিকের গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

খানিকটা গিয়ে বেহারী ডাক্তার রোডের ভিতর দিয়ে চক্রবেড়ে রোডের মধ্যে পড়ে পশ্চিম দিকে ট্রাম লাইনে পৌঁছবে। গাড়িটা আজ না এনেই ভাল করেছে, বুদ্ধিমানের কাজ করেছে! বড় যেন বাড়াবাড়ি হ'য়ে যেত।

সুকুমার অত খেয়াল করেনি।

মনেও ছিল না তার—পাঁচকড়িমামার কোন জ্ঞাতি-গোত্র এখানে থাকে।

বাড়িটার কাছে আসতে মনে পড়ল—

পাঁচকড়িমামার জ্ঞাতি ভাই শঙ্করবাবুর প্রাসাদ এটি।

এককালের প্রচুর ধনী এঁরা।

বাইরে থেকে কেমন জবুথবু মনে হচ্ছে বাড়িটা।

সেদিনের সে জমজমাট নেই। হাতিশালের হাতি, ঘোড়াশালের ঘোড়া কোথায় চলে গেছে!

রাস্তার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বাড়িটার একধারে নোনালাগা আস্তাবলটায় একটা ঘোড়া বুঝি পা ঠুকছে—লম্প জ্বেলে ভোজপুরী কি গয়া জিলাবাসী সহিসের সুর ক'রে তুলসীদাস রামায়ণ পাঠের চেষ্টায় বিহারী ডাক্তার রোডটা সেকেলে মনে হয়। সামনের বস্তিটা তো এই সেদিন একটা পুকুর ভরাট ক'রে তৈরি হয়েছে।

শঙ্করবাবুরা জমিদার—সুন্দরবন অঞ্চলে বিরাট জমিদারি ওদের।

সিন্ধুবাসিনীর কাছে সুকুমার শুনেছিল, শঙ্করবাবুকে দত্তক নিয়ে জনৈক সারদাপ্রসাদ ঐ বিরাট জমিদারি দিয়ে গেছেন। না হ'লে অত বড় জমিদারি ওরা পাবে কোত্থেকে! কি ছিল ওদের জানতে কারো বাকি নেই। রাতারাতি বড়লোক-ওরা!

এতরাত্রে শঙ্করবাবু বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে।

রাস্তার দিকে চেয়ে কার যেন অপেক্ষা করছেন।

সুকুমারকে আসতে দেখে মেজাজী গলায় প্রশ্ন করলেন, কে যায়?

যেন আজো সবাই ওঁর প্রজা! সুকুমার জবাব দিলে না।

শঙ্করবাবু গলাটা উচ্চ ক'রলেন—ছোট্ট বিহারী ডাক্তার রোডটা প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো—কে যায় ?

অদূরে দাঁড়িয়ে সুকুমার সাড়া দিলে, আমি।

আমি কে ? শঙ্করবাবু প্রশ্ন করলেন। চেনা চেনা মনে হ'চ্চে।

আমি পাঁচকড়িবাবুর—

সুকুমার শেষ করবার আগেই শঙ্করবাবু বললেন, চিনিচি, সিন্ধুর ভাসুরপো। দক্ষিণের জমিদার না তোমরা ? অনেকদিন পরে।···তা এদিকে কোথায় ?

আশ্চর্য স্মরণশক্তি ভদ্রলোকের। সেই কবে একবার না দুবার পাঁচকড়ি-মামার মেয়েদের নিয়ে এ বাড়ির দেউড়ি পেরিয়েছিল। শেষ বোধ হয়, শঙ্কর-বাবুর মেয়ে কমলার বিয়েতে এসেছিল।

সুকুমার বললে, পাঁচকড়িমামার ওখান থেকে আসচি।

শঙ্করবাবু বললেন, তা বেশ। পাঁচকড়ি কেমন আছে ?

সুকুমার বললে, ভাল।

ভাল থাকলেই ভাল, যে দিনকাল পড়েচে। সিন্ধু কেমন আছে ?

ভাল। সুকুমার ভদ্রলোকের প্রশ্নের ধরন বুঝতে পারে না। জমিদারোচিত, না পাড়ার সাধারণ বুড়ো ভদ্রলোকের মত ?

তা বেশ ! শঙ্করবাবু বললেন।

সুকুমার খানিক এগিয়ে গেল।

পিছন থেকে শঙ্করবাবু ডাকলেন, শোন, শোন—

সুকুমার ফিরলো।

শঙ্করবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ওদের বাড়ি তুমি রোজ যাও ?

কেমন জেরার মত মনে হয়। সুকুমার বললে, না।

তা বেশ ! শঙ্করবাবু বললেন, তা হ'লে তুমি আর কি জানবে !

সুকুমার 'জানার কথাটা' জিজ্ঞেস ক'রবে কিনা ভাবলে। আর এঁদের কথা জেনেই বা তার লাভ কি।

যেন দু'টো বড়লোকই দু' অবতার হ'য়ে গেছেন—একজন মাতাল আর একজন পাগল।

হঠাৎ শঙ্করবাবু বললেন, সুদের কারবার আজকাল আর চলে না…হক সাহেব দফারফা ক'রে দিয়ে গেচে। জমিদারিও সব যাবে এবার…মোছলাটা প্রজাস্বত্বের কুটকপালে আইন সব করে গেচে। বেঙ্গল টেনেন্সি অ্যাক্টের নানা ধারা বেরিয়েচে।

সুকুমার চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনলে।

কোনটাই তার ভাববার বিষয় নয়।

শঙ্করবাবু বললেন, তুমি তো ছোকরা শুনি খুব লেখাপড়া করেচো। দুনিয়ার হালচাল দেখে তোমার কি মনে হয়—কিছু থাকবে? বেশ, আমার না হয় পড়ে-পাওয়া, কিন্তু যাদের পৈতৃক, তাদের?

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল।

রাতদুপুরে আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে।

এতক্ষণে কখন বাড়ি পৌঁছে যেত।

ছিটকে বেরিয়ে এসে সুকুমার বললে, সব থাকবে, কিছু ভাববেন না।

পিছন থেকে শঙ্করবাবু বললেন, তা বেশ।

তখনই সুকুমার কানাঘুষা শুনেছিল, শঙ্করবাবু রেস খেলতে আরম্ভ ক'রেছেন। এবার জমিদারিটা ওড়াবে। কত কষ্টের পয়সা সারদাবাবুর… যেমন পুষ্যিপুত্তুরকে দিয়ে গেছেন!

ও বাড়ির আলোচনাটা পাঁচকড়ি মিত্তিরের অন্তঃপুরে সিন্ধুবাসিনীর মুখে শোনা যেত। তাঁর কাছে ঠিক জানা যেত বিহারী ডাক্তার রোডের এঁরা কখন কি করেন। রামা নানা ছুতোয় এ বাড়িতে আসতো। গুপ্তচরের মত নানা সংবাদ সংগ্রহ করতো।

স্বার্থের কোন সম্পর্ক ছিল না, তবু জাতি হিসাবে আগ্রহের অভাব ছিল না। কি ক'রে ঐ জমিদারির পয়সার সঙ্গে নিজেদের পয়সার তুলনা

ক'রবেন মেজোকাকী তার অজুহাত খুঁজতেন। 'পরের পয়সায়' আমার বাপ-ভাইরা অমন বড়মানষী করে না। দস্তুর মত স্বোপার্জিত।

আর সেই থেকে সুকুমার জেনেছে, ভবানীপুরের নফর কুণ্ডু রোডের পুরোনো মিত্তিরদের এই শাখার বাড়বাড়ন্ত কিসে।

পাঁচকড়িমামার ঠাকুরদার 'রাইস মিল' ছিল চেতলায়, ময়দার কল ছিল উল্টোডিঙ্গীতে আর তেলের কল ছিল হাতিবাগানে হোগল কুঁড়ের গলিতে।

পাঁচভূতে সে সব নষ্ট ক'রে দিয়েছে—নইলে সে সব আজ থাকলে গোটা ভবানীপুরটা পাঁচকড়িমামার হ'তো।

তবু কিছু কম দেখেনি সুকুমার কলকাতায় এসে।

ঘরে ঘরে মোজেক মার্বেল, আসবাবপত্র, খাট-বিছানা, পালঙ্ক। পাঁচকড়ি-মামা সকাল-সন্ধ্যে ঐ সাজান-গোছান সদর ঘর আলো ক'রে ব'সে থাকতেন—কত লোকজন কি জন্যে যেন এসে উঠোনটার ওপর অপেক্ষা ক'রতো। ডাক হ'লে এক এক ক'রে উঠে যেত, খানিক ঘরের ভিতর পাঁচকড়িমামার টেবিলের সামনে চুপ ক'রে দাঁড়াত, তারপর মাথা নীচু ক'রে বাইরে বেরিয়ে আসতো টাকা গুনতে গুনতে, পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে।

কত টাকা রোজ পাঁচকড়িমামা লোকজনদের দিতেন, কত টাকা পেতেন!

পরে জেনেছিল সুকুমার, পাঁচকড়িমামা সুদের কারবার করেন।

ব্যবসা গুটোন পয়সাগুলোর বাচ্চা পাড়ান।

দেওয়ালের গা ফুঁড়ে পাঁচ সাতটা লোহার সিন্দুকের খোপ—সিন্দুর-চন্দনের ফোঁটায় অদ্ভুত দেখাত। সিন্দুকের গহ্বরটা বোধ হয় একেবারে মাটির তলায়, ভিতের সঙ্গে মিশে।

খুব হিসাবী আর হুঁসিয়ার মনে হ'তো পাঁচকড়িমামাকে।

এমন একটা বাঁধা-ধরা নিয়মে সংসার চালাতেন বোঝবারই উপায় ছিল না, কোথা থেকে কি হয়।—বেশ সুখের স্বচ্ছন্দের সংসার।

সব যেন কেমন গোলমাল হ'য়ে যায় সুকুমারের।

এক সঙ্গে দুটো বনেদী বড় বাড়ির আশ্চর্য অভাবনীয় পরিবর্তন চোখে পড়ে।

একদিন যাঁদের কিছুতে আপন পর্যায়ের মনে হ'তো না, আজ তাঁরা যেন অনেক পিছনে পড়ে আছেন—রেশমের গুটির মধ্যে যেন পোকা কখন শুকিয়ে মরে গেছে।

শেষটা মিত্তির বাড়ির মেয়েদের পাত্র তাকে সন্ধান ক'রে দিতে হবে। দুনিয়ার হালচালের খবর শঙ্করবাবুকে শোনাতে হবে। বড় যোগ্যতা যেন বেড়েছে সুকুমারের।

মনে মনে এককালে এই সব ধনীদের প্রতি যে বিরাগ ছিল সুকুমারের কখন তা সমবেদনায় রূপান্তরিত হয়।

ওঠা-নামার ইতিহাস আশ্চর্য।

একদা দৈবানুগ্রাহী ওরা আর সুখে নেই, এইটাই যেন একালের দৈব অনুগৃহীতদের সান্ত্বনা।

ওদের ওপর আর রাগ ক'রবে কি। এখন নিজের জ্বালায় ওরা অস্থির।

নিজের ধান্দায় যেমন এতদিন ভুলে ছিল তেমনি ভুলে থাকবার চেষ্টা করেছিল সুকুমার। কিন্তু ভুলতে পারেনি।

সেই আগেকার কলেজ জীবনের মত পাঁচকড়িমামার বাড়িটা আবার তাকে আকর্ষণ ক'রতে লাগল, উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে, ঘুরতে-ফিরতে।

প্রায় মাস খানেক পরে হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় সুকুমার নফর কুণ্ডু রোডের পুরোন মিত্তির বাড়ি এসে উপস্থিত হ'লো।

নিজের গাড়িটাকে সে বড়-বাড়ি থেকে একটু দূরে রাখলে। তারপর পায়ে হেঁটে রাস্তা পেরিয়ে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল।

রাস্তার দু'ধারে এখন নানা ধরনের বাড়ি উঠেছে।

নন্দকুণ্ডু রোডের সে নির্জনতা নেই। আকাশে অনেক তারার ভিড়ে সূর্য হারিয়ে গেছে।

রাস্তা থেকে চোখ তুলে চেয়ে দেখলেও কোন বিশেষত্ব আজ চোখে পড়ে না মিত্তির বাড়ির। বাড়ি তো বাড়ি!

তার চেয়ে আশপাশের বাড়িগুলো অনেক বেশী আর্কষণীয়।

লোহার গেটটা আধ-ভেজান ছিল। সুকুমার ঠেলে ঢুকে পড়ল এদিক-ওদিক চেয়ে।

যা ছিল তাই আছে—সিমেন্টের উঠানে পাথরের মূর্তিগুলো নির্বাক, স্থির। অলিন্দের নিভৃত কুঞ্জে পায়রা ডাকছে। সদর-ঘরটা বাইরে থেকে তালা বন্ধ।

তা হ'লে পাঁচকড়িমামা নেই।

কি ভেবে গলা ঝাড়া দিয়ে সুকুমার বার কয়েক শব্দ করবার চেষ্টা ক'রলে। আওয়াজ পেয়ে কটা পায়রা এদিক-ওদিক উড়ে গেল—মাথার ওপর আকাশটা কেঁপে উঠলো।

সেদিনকার কথা মনে পড়ল সুকুমারের—এইখানে পাঁচকড়িমামা বেহুঁস হ'য়ে পড়েছিলেন।

ভিতর-বাড়ি থেকে তার ডাকের উত্তরে শাঁখের শব্দ কান্নার মত হঠাৎ বেজে উঠেছিল—পুঁ-পুঁ-উঁ-উঁ।

আজ কোন সাড়া-শব্দ নেই বাড়িটার কোথাও।

নিজে থেকে সাড়া দেবারও কোন কারণ নেই।

সামনের দরজাটার দিকে না গিয়ে—স্বপ্নে-দেখা অচেনা জগতের গুপ্ত পথের সন্ধানে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হওয়ার মত—সুকুমার উঠানের বাঁ দিকে এগিয়ে গেল।

অন্দর-মহলে পৌঁছান সরু চোরাগলিটা এখনো আছে !

গলিটার সামনে দাঁড়াতে কেমন একটা স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ নাকে এল সুকুমারের। পাতালের গন্ধ কি না কে জানে।

এই পথে আগে অনেক আসা-যাওয়া করেছে সুকুমার—চোর হয়ে পাঁচকড়িমামার মেয়েদের কাছ থেকে কত লুকিয়েছে !

কী সরু পথটা, তখন গা-হাত-পা কত ছড়ে গেছে তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে !

এখন ওপথে কিছুতে যাওয়া যাবে না।

শরীর অনেক মেদবহুল হ'য়ে গেছে বয়েসধর্মে। জাঁতিকলে ইঁদুর পড়ার মত অবস্থা হবে।

ফিরে এসে সুকুমার মাঝের বাড়ির দরজাটায় ধাক্কা দিলে।

এ দরজাটাও ভেজান ছিল, খুলে গেল।

এখানেও সেই নীরবতা, কোথায় কে ! নির্বান্ধব পুরীর মত।

কোথাকার রাজপুত্র নিঃশব্দে সব ঘর ঘুরে ঘুরে দেখছে—যা খুঁজছে তা পাচ্ছে না।

পথ পেরিয়ে ঘরদোর মাড়িয়ে আর একটা উঠানে এসে সুকুমার থামলো।

উঠানের এক ধারে নারকেল গাছটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় টাক পড়ার মত কটা পাতা যেন বাতাসে ফুরফুর ক'রছে। দড়ির কলটা নেই। কাক-চিল-শকুন বুঝি ও গাছে আর বসে না। পাতায় ভার সহ্য হয় না।

উঠান পেরিয়ে সুকুমার রোয়াকে উঠতে মাঝের বাড়ির ছাদের ওপর থেকে মেয়েদের কে যেন লক্ষ্য ক'রে ডাকলে, সুকুদা !

চমকে সুকুমার চোখ তুলে ওপরে চাইলে।

অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ বোধ ক'রলে।

কে ডাকলে ?

ছাদের আলসেয় আর কাউকে দেখা গেল না।

মনে মনে সুকুমার হাসলে। যেন আর সাড়া না ক'রলে সুকুমার ওদের কাছে পেঁছিতেই পারবে না—এবাড়ির পথ-ঘাট সুকুমারের জানা নেই।

আবার ডাক এল—সুকুদা!

মাথা নীচু ক'রে সুকুমার সোজা সিঁড়ির পথ ধরলে, কোন দিকে আর চেয়ে দেখলে না।

দোতলার সিঁড়ির মাথায় লীলাবতীর সঙ্গে দেখা।

সুকুমার পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রতে তিনি জিজ্ঞেস ক'রলেন, কখন এলে? ভাল তো সব?

সুকুমার বললে, এই আসছি। আপনি কেমন আছেন?

বেশী কথা কোন দিন লীলাবতী বলেন না।

মৃদু স্বরে লীলাবতী বললেন, ভাল।

সুকুমার জিজ্ঞেস ক'রলে, মামাবাবু কোথায়? তাঁকে তো দেখলুম না সদরে!

প্রশ্নটা যেন লীলাবতী ঠিক বুঝতে পারেন না। কেমন অবাক দৃষ্টিতে সুকুমারের মুখের দিকে চাইলেন।

এ বাড়ির স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে প্রশ্নটা নেহাৎ-ই বাচালতা।

তাছাড়া কার খোঁজ তিনি রাখেন!

অত খবরে তাঁর দরকার কি?

তবু লীলাবতী উত্তর দিলেন, কোথায় গেছেন বোধ হয়!

সুকুমার বললে, ও।

লীলাবতী বললেন, ওরা সব তেতলার ছাদে আছে—দিদিমণিও আছেন।

যেন এবাড়িতে সুকুমার আর কোন প্রয়োজনে আসেনি, সেই আগের মত পাঁচকড়িমামার মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে এসেছে।

সুকুমার খানিক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। লীলাবতী যেন তাকে বড্ড ধ'রে ফেলেছেন মাঝপথে।

আশ্চর্য, পাঁচকড়িমামার স্ত্রীর এতটুকু পরিবর্তন হয়নি।

আগেও যেমন দেখেছিল আজও তেমনি আছেন। বড় একটা কড়ির পুতুল যেন, ভাবলেশহীন নির্বিকার।

নেহাৎ প্রয়োজনে চলাফেরা ক'রে বেড়ান এ বাড়ির চেনা-শোনা কয়েকটা ঘর-দোরে।

এ বাড়িতে লীলাবতীর প্রয়োজন কেবল গর্ভধারণ ক'রতে।

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা! যতদিন না বীরেশ্বর হ'য়েছিল ততদিন ভার্যার সম্মান তিনি পাননি।

অনাদর ছিল না। কিন্তু কেমন যেন তাঁর অস্তিত্বও কেউ টের পেত না।

না আদর, না অবহেলায় আপন আত্মজাদের সঙ্গে মিলে মিশে কলের পুতুলের মত হ'য়ে গিয়েছিলেন।

বীরু হতে একটু যেন তাঁর স্বাতন্ত্র্য বোঝা গিয়েছিল। ছোট্ট বীরেশ্বরকে কোলে নিয়ে যখন তিনি ভিতর-বাড়ির কোন একটা ঘরে চৌকির ওপর বসে থাকতেন তখন সুকুমারের 'গণেশ জননীর' কথা মনে হ'ত!

নিজে লীলাবতী অত সুন্দরী, কিন্তু তাঁর গর্ভজাত সন্তানগুলি তেমন সুন্দর হয়নি!

মেয়েদের সৌন্দর্য নিয়ে সিন্ধুবাসিনী অনুযোগ করতেন: কোত্থেকে এগুলো এলো বৌদির পেটে!

ভাইঝিদের বিয়েতে রঙ-এর মূল্য বাবদ কত হাজার টাকা খেসারৎ দিতে হবে তারও হিসেব সিন্ধুবাসিনী দিতেন।

পাঁচকড়ি মামা মেয়েদের দুধের সর মাখাতে বলতেন।

আরো কি সব ওষুধপত্র সিন্ধুবাসিনী খাওয়াতেন। সুকুমারই সংগ্রহ ক'রে দিত।

নিজে সুন্দর হয়েও লীলাবতীর মনে সুখ ছিল না।

মুখে না বললেও স্থকুমার বুঝতে পারতো—তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পেত। কেমন একটা অপরাধবোধে সবার কাছে তিনি যেন জড়-সড় হয়ে থাকতেন সব সময়।

ভয় করতেন তিনি সবাইকে, স্বামীকে, ননদকে, আত্মজাদের।

স্থকুমার জিজ্ঞেস ক'রলে, আপনি কোথায় চল্লেন?

লীলাবতী হাসলেন।

অর্থাৎ, যাবেন আর কোথায়! এই গণ্ডির মধ্যেই ঘুরে বেড়াবেন।

স্থকুমার আর কোন প্রশ্ন না করে উপরে উঠে গেল।

আজো এ মানুষটিকে বিশেষ খেয়াল না করলেও চলে।

বড় শান্ত মানুষটি!

স্থকুমারকে দেখে মেয়েরা হৈ-হৈ না ক'রলেও তাদের উচ্চকিত আনন্দ প্রকাশ পেল।

সিন্ধুবাসিনী অভ্যর্থনা করলেন, আয়! ওরে মেয়েরা স্থকুদাকে নিচে নিয়ে গিয়ে বসা।

স্থকুমার লক্ষ্য করলে—

বড়ি দেবার জন্যে এক গামলা ডাল বাটা সামনে বসান। মীরা একমনে হস্তাঙ্গুলীর বিশেষ এক ভঙ্গি ক'রে পরিষ্কার কাপড়ের ওপর বড়ি ফেলছে। সুদক্ষ শিল্পীর মত ওর বসবার ভঙ্গিটি। ওর কাঁধের দু'পাশ দিয়ে যেন আবেশে শিথিল কেশ গড়িয়ে পড়েছে।

মীরা কোন সাড়া করলে না। মুখ তুলেও চাইলে না। বড়ি দেওয়া ছাড়া তার কোন কাজ নেই। বড়ির জগতে সে যেন ডুবে আছে।

বুঝি বুঝতে পেরে রেবা বললে, মেজদি, দেখ কে এসেছে।

রেখা বললে, স্থকুদা রে! কোন্ দিকে আজ সূর্য উঠেচে ভাই?

মাথা নিচু করেই মীরা বললে, শিপু, আমার চুলটা ঠিক ক'রে জড়িয়ে দে না।

সুকুমার মন্তব্য করলে, একজন বড়ি দেবে, তার জন্যে একজন ডাল বেটে দেবে, একজন ডাল ফেঁটে দেবে, একজন কাপড় পেতে দেবে, একজন বেশবাস ঠিক ক'রে দেবে—এ যেন—

সুকুমার মন্তব্যটা সম্পূর্ণ করলে না।

মীরা মাথা নেড়ে কেশভার পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল—যেন তার হুশ হলো এতক্ষণে।

কে সুকুদা? পথ ভুলে নাকি!

কি মনে হয়? সুকুমার পাণ্টা প্রশ্ন ক'রলে, পথ ভুলে কি কেউ ঠিক জায়গায় পৌঁছয়!

সত্যি ঠিক জায়গায় এসেচো তো? দেখো আবার—মীরার হাতময় ডাল বাটা।

আবার কি? সুকুমার প্রশ্ন ক'রলে।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, ঝগড়া পরে করিস তোরা। সেই দাঁড়িয়ে রইলি! নিয়ে যা সুকুমারকে, বসা। বড্ড রোদ এখানে—

রেখা ডাকলে, এস সুকুদা পথঘাট তোমার আবার জানা নেই।

সুকুমার বললে, খুব যে কথা শিখেছিস সব!

পিসির কানকে আড়াল ক'রে মীরা বললে, কথার আর দোষ কি?

সুকুমার কিছু উত্তর দেবার আগেই সিন্ধুবাসিনী উঠে এগিয়ে এলেন, আয় আমরা নিচে যাই—ও মেয়েদের কথা তুই শুনিস কেন!

আবার যেন সব সেই আগের মত। আদর আপ্যায়ন!

যে ঘরটায় এসে সুকুমার বসতো সেই ঘরে এসে বসল।

শ্বেতপাথরের সেই গোলটেবিলটা ঘরের মাঝখানে তেমনি পাতা আছে। একটা চেয়ারও আছে সামনে। দেয়াল জোড়া বড় আয়নাটার মুখে কেমন যেন মেচেতা পড়েছে, ফ্রেমের কারু-কাজ অনেক বিকৃত হ'য়ে গেছে।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, বস্‌, হাত ধুয়ে আসি।

সুকুমার বসল না।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আশপাশ চেয়ে কি যেন দেখতে লাগল।

ঘরটায় কিছু পরিবর্তন হয়নি।

অন্দরমহলের এই ঘরটা অন্তঃপুরিকাদের খাস দখলে। খুব অন্তরঙ্গ আত্মীয় না হ'লে এই ঘরে সদর পেরিয়ে কেউ আসতে পারে না। মিত্তির বাড়ির মেয়েদের 'মনের কথা' বলবার ঘর এইটি। সামনের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে মনে হবে না, আর কোন জগত আছে এই বাড়ির অন্দি-সন্ধি পেরিয়ে!

দিনের বেলায় আলো জেলে রাখতে হয় এ ঘরে।

খানিক পরে সিন্ধুবাসিনী একথালা খাবার হাতে ক'রে ঘরে ঢুকলেন। সুকুমার কিছু বলবার আগে তিনি বললেন, থাম্‌ বাপু জ্বালাসনি!······নে বস্‌, সেই দাঁড়িয়ে রইলি!

হঠাৎ জলযোগের আহ্বানে সুকুমার বড় লজ্জা পায়। সেই ভালমন্দ খাবার লোভ কি এখনো তার আছে!

কুটুম নাকি সে?

তবু বসতে হলো।

সিন্ধুবাসিনী সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ সিন্ধুবাসিনী জিজ্ঞেস ক'রলেন, হ্যাঁরে সুকু, তুই নাকি গাড়ি করেছিস?

সুকুমার লজ্জা পেল। কোন উত্তর দিতে পারলে না।

সিন্ধুবাসিনী বলতে লাগলেন, শুনে কী আনন্দ হলো বলবার নয়! হোক হোক, পাঁচজনে দেখুক।

বাইরে দাঁড়-করান গাড়িটাকে এখুনি গিয়ে লুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল সুকুমারের। মনে হলো, গাড়িটাকে কেউ ঠেলে ঠেলে নফরকুণ্ডু রোডের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে আক্রোশে।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, জানিস তো দাদা সে গাড়ি বেচে দিয়েচে।......কি পেট্রোলের তখন হাঙ্গামা! .....তারপর ড্রাইভারকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দাও .... হাতি পোষার সামিল! তোর গাড়িটা কত বড়?

ছোট্ট! সুকুমার কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে।

গাড়ি প্রসঙ্গ সে চাপা দিতে চায়। এ বাড়িতে আর কারো বাড়ি-গাড়ির মালিকানা নিয়ে আলাপ যেন নীতি বিগর্হিত। তুলনায় মিত্তিরদের সঙ্গে কিছুই নয়। যে যতই বড়মানুষী করুক—

সিন্ধুবাসিনী জিজ্ঞেস ক'রলেন, বাড়ি-টারি করেচিস তো? না, দাদার মত দু'হাতে খরচ করচিস?

সন্দেশটা গলা দিয়ে নামিয়ে দিতে সুকুমার জলের গ্লাশটা মুখের কাছে ধরলে।

উত্তর দিলেই বিষম খাবে নির্ঘাত।

হঠাৎ অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সিন্ধুবাসিনী বললেন, কতকাল তোদের দেখিনি! তোরাও ভুলে গেছিস মেজো-কাকীকে! সেই কবে একবার এসেছিলি—

সুকুমার অপরাধ স্বীকার করলে।

আত্মীয়তা তার উঠিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি, হাজার কাজের লোক হোক সে।

একদিন এঁদের সম্বন্ধে পাড়াগাঁ থেকে এসে কলকাতা সুকুমারের ভাল লেগেছিল। চতুর্দিকে কেমন এক ধরনের অনাত্মীয়তার মাঝখানে পরম আত্মীয়-তার স্বাদ সে এখানে পেয়েছিল।

মেজো-কাকীর মত মানুষ সে দেখেনি!

সিন্ধুবাসিনী বললেন, একদিন আনিস না তোর মাকে, বৌকে।...না হয় বাপের বাড়ি পড়ে আছি, তোদের জন্যে কি মন কেমন ক'রতে নেই?

সুকুমার চুপ করে রইল।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, ক'টি ছেলে হলো রে বৌ-এর?

সুকুমার বললে, কিছু না।

সে কি রে। অনেকদিন তো বিয়ে হয়েচে। এখনো ছেলে হলো না? বৌ বাঁজা নাকি?

সিন্ধুবাসিনী অবাক হলেন।

সুকুমার বললে, বৌ মরে গেছে।

সিন্ধুবাসিনী স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন।

এত নিকট আত্মীয় হ'য়ে এতবড় একটা ঘটনা তিনি অবগত নন।

বুঝি কাঁদলেন, আমাকে তোরা খবর দিবি কেন।......আমি তোদের কে? কিছু তো ক'রতে পারি না......নামেই কাকী।

সুকুমার ভারি অপ্রস্তুত বোধ করে।

এ এক মহা বিপদের মধ্যে পড়েছে স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ বলে ফেলে।

না বললেই হত।

এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নয় ওটা আত্মীয়তার নূতন সূত্রে।

চোখ মুছে সিন্ধুবাসিনী বললেন, কবে এ সর্বনাশটা হলো শুনি?

অনেকদিন! বিয়ের দু'বছর পরে!

সুকুমার আস্তে আস্তে বললে।

সিন্ধুবাসিনী মনে মনে কি যেন ভাবলেন।

খানিক চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, আর বিয়ে করিসনি?

সুকুমার ম্লান হেসে বললে, না!

সিন্ধুবাসিনী খানিক অন্যমনস্ক হলেন।

তারপর বললেন, কি যে হাসিস তোরা বুঝতে পারি না। সব তাতে তোদের হাসি আসে কি করে? আজকালকার কি যে হয়েচে, কেউ বিয়ে করতে চায় না—ফ্যাশান!

সুকুমার উঠে গিয়ে গ্লাস থেকে জল নিয়ে হাত ধুলে।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, তোর মা কিরে! তেমনিই আছে?

সুকুমার বললে, মাকে তাই কে দেখে!

কেন, কি হয়েচে?

সেই অম্বলের ব্যথা। তারপর নানা রোগ লেগে আছে।

তা বলে তোরা বিয়ে করবিনি? সুবোধেরও বিয়ে দিসনি তো?

না। সে বিয়ে করতে চায় না।

তুই না ক'রলে সে কি ক'রে করে?

আমি তো করেছিলুম।

সে কথা বাদ দে। সুবোধ আজকাল কি করে? খুব বড় হ'য়ে গেচে, নারে? সেই কতটুকু একবার এখানে এসেছিল!.......

তা অনেক বড় হয়েছে। আমারই ধর না কম বয়েস হ'য়ে গেল। বুড়ো হ'য়ে গেলুম।

তুই আর জ্বালাসনি সুকু। শঙ্করদার বড় ছেলে তাই তোর চেয়েও বড় পাঁচ ছ বছরের।

তাতে কি আমি ছোট হ'য়ে থাকবো চিরকাল? বয়েস হয়নি?

হ'য়েচে! হ'য়েচে! সেদিনকার সুকু তুই—হ'তে যদি না দেখতুম!

কাকে হ'তে দেখলে মা-মনি?

মীরা ঘরে ঢুকলো।

সম্পূর্ণ পটপরিবর্তন। কখন নিভৃতে প্রসাধন সেরে এসেছে।

সত্যি কি তার প্রয়োজন ছিল, সুকুমার ভাবলে।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, তোর সুকুদা। শোন ছেলের কথা, বুড়ো হ'য়ে গেচে!

মীরা চোখ তুলে চাইলে।

কে জানে, সত্যিকার কার বয়েস হ'য়ে গেছে!

আর বুঝি মীরার বয়েস লুকোন যাবে না।

মীরা চোখ নামিয়ে নিলে।

হোক সুকুমার তাদের আত্মীয়, তবু যেন তার এই মুহূর্তে নিজে থেকে সামনে এসে দাঁড়াতে বড় লজ্জা করে। বয়েস তো তারও হ'য়েছে!

মীরা দাঁড়িয়ে রইল।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, তোর সুকুদাকে খেয়ে যাবার কথা বললিনি?

সুকুমার তাড়াতাড়ি বললে, না, না, অনেক খেয়েছি!

সে হয় না, আজ এখানে খেয়ে যাবি। সেদিন কখন এলি, কখন গেলি, কিছুই জানতে পারলুম না।

সিন্ধুবাসিনী ঘর থেকে ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

সুকুমার খানিক চুপ ক'রে মীরাকে লক্ষ্য ক'রে বললে, কি, তোমারও তাই মত নাকি! না খাইয়ে ছাড়বে না?

মীরা বললে, আপনার ইচ্ছে!

তোমাদের ইচ্ছে নেই?

নিজের কানে প্রশ্নটা কেমন শোনায় সুকুমারের।

তাতে আপনার কি? মীরা চোখ তুলে বললে।

থতমত খেয়ে সুকুমার বললে, না, তাই জিজ্ঞেস করছি।

দোর গোড়ায় পাঁচকড়িমামার আর মেয়েগুলো এসে দাঁড়াল।

সমস্বরে বললে, সুকুদা, মা-মনি চান করতে বললে। ওঠ—

হঠাৎ সুকুমারের খেয়াল হ'লো মীরা তাকে এ পর্যন্ত আপনি সম্বোধন ক'রে এসেছে।

এরা কিন্তু তাকে 'তুমিই' বললে।

মীরা নিজেকে এদের থেকে বিশিষ্ট করতে চাইছে।

সুকুমার বললে, মা-মনিকে বল, আমি আর একদিন আসবো, খাবো—আজ বড় কাজ আছে।

মেয়েরা বললে, থাক, আর কোন কথা শুনবো না।

কি খেয়াল গেল, সুকুমার বললে, বেশ তোমার মেজদি যদি বলেন—

কথাটা নিছক রহস্য কিনা কে জানে, মীরা বোনেদের কাছ থেকে সরে গেল। সুকুদা কি যে যা তা বলছেন।

সেই মীরাকেই শেষ পর্যন্ত সব ব্যবস্থা ক'রতে হ'লো।

রেখা, রেবা, শান্তা, শিপ্রা কাউকে আর ধারে কাছে দেখা গেল না।

নেপথ্যে সিন্ধুবাসিনীর গলা পাওয়া গেল, একটা কাজ যদি মেয়েগুলোকে দিয়ে হয়। ওপরে উঠে কি যে রাজকাযি্য করচেন রাজনন্দিনীরা।

এক সময় মীরা তেল, গামছা, সাবান, কাপড় নিয়ে এগিয়ে এল।

দোর গোড়া থেকে ডাকলে, আসুন।

জামাটা খুলে মীরার হাতে দিয়ে সুকুমার বললে, আচ্ছা মীরা, আমাকে এমন অপ্রস্তুত ক'রে তোমার কি লাভ হচ্ছে? না হয় কোন দোষই করেচি, তার জন্যে আজ্ঞে, পরাজ্ঞে।

মীরা বললে, দোষ করবেন কেন? আপনি বলা কি দোষের?

তা জানি না। কিন্তু তোমার মুখে শুনতে ভাল লাগছে না। সুকুদা তোমাদের কবে আপনি হ'য়ে উঠলো?

কলতলায় এসে মীরা বললে, মনে আছে সুকুদা?

কি? মীরার স্বাভাবিক-কণ্ঠস্বরে সুকুমার অবাক হ'য়ে যায়।

একবার এখানে তুমি কি জোর আছাড় খেয়েছিলে? মুখে আঁচল দিয়ে মীরা হাসতে থাকে।

কবে? কথাটা যেন মীরার বানান, সুকুমার বিস্মৃতির ভান করলে।

মীরা বললে, কবে মনে ক'রে দেখ না।

কই, মনে পড়ছে না তো।

তেমনি সুকুমার ভান করলে।

হাসি থামিয়ে মীরা বললে, সত্যি তোমার মনে পড়চে না সুকুদা ?

আর বুঝি সুকুমার মিথ্যে বলতে পারে না। বললে, সে তো তোমার জন্মে .....পিছন থেকে এমনি তাড়া দিয়েছিলে সেদিন, উঃ।

মীরা হেসে উঠলো : নিজে পড়লে, আর আমার দোষ হলো !

না, আমার দোষ। লোক হাসাতে ইচ্ছে ক'রে পড়ে গেলুম। ঐ যে একটা কথা আছে, মানুষ পড়লে চেপে ধর, গরু পড়লে তুলে ধর।

মীরা হাসতে থাকে সেদিনের মজার কথাটা মনে ক'রে।

মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন সিন্ধুবাসিনী।

এতটুকু চোখের আড়াল হ'লেই খোঁজ করেন—কোন্ মুল্লুকে গিয়ে বসে আছেন। আর কি, উড়তে শিখবে এবার। ধিঙ্গি হ'চ্চেন—না বাবা, আমার কম্ম নয়।

আশ্চর্য, এত ক'রেও পাখি ওড়েনি।

বাইরে থেকে উদার আকাশের অনেক খবর এই সব পাখিদের কানে পৌঁছায়। আশেপাশে কত পাখির ভিড়, কত নতুন কলরব।

তাদের পাখা আজো দুর্বল, তাদের কণ্ঠ আজো নীরব।

সিন্ধুবাসিনী জিজ্ঞেস করেন, ছাদে এতক্ষণ কি করছিলি ? বলেছি না, একলা একলা কখনো ছাদে উঠবে না। ভাল কথার কাল নয়। বল্, কেন গিয়েছিলি ছাদে ?

রেখা বুঝি আর তত ভয় করে না পিসিকে। বললে, চুল শুকতে—

কেন, আর রোদ্দুর নেই ঘরে-দোরে? সিন্ধুবাসিনী জেরা করেন, বাহার করে ছাদের ওপর চুল শুকতে হবে! ফ্যাশান!

কি ঘর-দোরের ছিরি, রোদ্দুরে কাঠ ফাটচে! এক ছিটে রোদ আসে সকাল থেকে?

কেন যে রেখা মুখে মুখে আজ চোপা করে বুঝতে পারা যায় না।

শুনচিস মেয়ের কথা? ওর চুল শুকোবার জন্যে ঘর-দোর হা-হা ক'রবে। আর কেন, যাও, ঐ রাস্তার মাঝখানে চুল এলো ক'রে দাঁড়িয়ে থাক, অনেক রোদ, আলো-বাতাস পাবে। খুব বাহাদুরী হবে।

পিসির মুখের সামনে রেখা চুপ করে যায়।

এ বাড়ির মেয়ের মত কথা সে বলেনি।

তা ছাড়া বেশী কথায় হয়তো সন্দেহ বাড়তে পারে।

সত্যি চুল শুকতে সে ছাদে ওঠে না যখন-তখন।

রেবা জানে, মীরা জানে, রেখার ব্যাপারটা।

পূব দিকের ঐ তেতলা নতুন বাড়িটার চিলে কোঠায় ওর দৃষ্টি যখন-তখন যায়। কে যেন আটকে আছে, কাকে যেন রেখা দেখেছে।

রেবা বলে দিতে চেয়েছিল, মীরা নিষেধ ক'রে দিয়েছে।

রেখাকেও মানা করেছে। 'মা-মনি' জানলে রক্ষা রাখবেন না। এমন কাজ যেন রেখা আর কখনো না-করে।

তবু মাঝে মাঝে তর্ক ক'রে ফেলে রেখা।

অত বাঁধাবাঁধি কেন, ছাদ থেকে তো সে উড়ে যাচ্ছে না, কি লাফিয়ে রাস্তায় পড়ছে না? না হয় ছাদে একলা-একলা উঠেছে, না হয় কাউকে দেখেছে—ক্ষয়ে তো যায়নি কিছু!

কেবল যাসনি, করিসনি, দেখিসনি—

পিঠোপিঠি বলে রেবাকে অনেক ঘুষ দিতে হয় রেখাকে।

মেজদিটা ভালো। ধরা পড়লে গম্ভীর ভাবে উপদেশ দেয় মিত্তির বাড়ির মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে রেবাই সেদিন প্রথম জিজ্ঞেস ক'রলে, আচ্ছা মেজদি, পয়সা হ'লে মানুষ বুঝি বদলে যায় ?

মীরা অন্যমনস্ক ছিল। বললে, কি ?

রেবা বললে, সুকুদার খুব পয়সা হ'য়েছে বুঝি !

মীরা বললে, তা তো জানি না

রেবা বললে, বীরুটা বলছিল, সেদিন নিজের মটর ক'রে সুকুদা আমাদের বাড়ি এসেছিল।

মীরা বললে, তাই নাকি ! তা হবে।

খানিক চুপ ক'রে থেকে রেবা বললে, গাড়ি ক'রে কেন সেদিন এসেছিল জানিস—দেখাতে ! নতুন গাড়ি হ'য়েছে—

মীরা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, ছিঃ রেবা, না জেনেশুনে যা তা বলতে নেই ! সুকুদা সে রকম লোকই নয়।

কেন যে রেবার সুকুমারকে সন্দেহ বোঝা যায় না।

সে অন্ধকারে হেসে উঠলো।

খুব ভাল লোক ! না হ'লে এ্যাদ্দিন পরে গাড়ি দেখাতে আসে !

মীরা চটে উঠলো, যাকে-তাকে যা-তা সন্দেহ করো না ! তোমাদের গাড়ি দেখিয়ে সুকুদার লাভ ?

রেবা কোন উত্তর দিল না, চুপ করে রইল।

মন থেকে সন্দেহের কথাটা সে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না কিছুতে।

মেজদি ছাড়া কি এ বাড়িতে আর কোন মানুষ ছিল না—সুকুদা তাদের দেখতে পেল না।

আবার যাবার সময় বলে গেছেন, একদিন তোদের নিয়ে যাব। গেলে তো আর ওঁর সঙ্গে।

খানিক পরে মীরা ডাকলে, ছোট, ঘুমলি?

রেবা চুপটি ক'রে রইল। কোন সাড়া ক'রলে না।

মীরা আবার ডাকলে, ছোট, এই ছোট……শুনছিস?

হঠাৎ ফোঁপানর শব্দ হ'লো ওধারের বিছানায়।

মীরা ব্যস্ত হ'য়ে উঠল।

কিরে ছোট, কাঁদছিস কেন? কি হলো?

অন্ধকারকে উচ্চকিত ক'রে রেবা ফুঁপিয়ে উঠলো।

মীরা ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, আরে পাগল, শুধু শুধু কাঁদছিস কেন?

নিজেকে রেবা আর সামলে রাখতে পারলে না।

পাগলের মত ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বললে, শুধু শুধুই তো! তোমাদের কি! তোমরা বুঝবে কেন?

রাত দুপুরে তোর হলো কি? চুপ কর, চুপ কর লক্ষীটি—মা-মনি জাগবে। করছিস কি?

রেবা বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললে, আমাকে কেউ দেখতে পারে না, কেউ ভালবাসেনা—তোমাকে সুকুদা ভালবাসে—সেজদিকে অরুণবাবু…

ভয়ে মীরার হাত পা হিম হয়ে আসে।

একি পাগলামি রেবার রাত দুপুরে! কে কাকে ভালবাসে তার খোঁজ।

চুপ! চুপ! মা-মনি শুনলে আর আস্ত রাখবে না। নিজেও মরবি, আর সবাইকে মারবি।

রেবা চুপ করে যায়।

অন্ধকারে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হয়।

দু'টি অশান্ত কুমারী হৃদয় ভয়ে, ভাবনায় কম্পমান দীপশিখার মত জেগে থাকে।

এখানে গবাক্ষ পথে আকাশ দেখা যায় না—নফরকুণ্ডু রোডের কোন্‌খানে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে—রেবার কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছে।

ছিঃ, রেবা কাঁদতে নেই। এমনি ক'রে নিজেকে হীন করো না। কাঙাল-পনা করো না। পুরনো মিত্তির বাড়ির মেয়ে না তুমি, তোমার জন্যে কত না সম্বন্ধ করা হচ্ছে? তুমি কি সাধারণ মেয়ে যে কারো ভালবাসার জন্যে তোমার দিন বয়ে যাবে?

রেখা ধরা পড়ে গিয়েছিল।

ছাদে ওঠা তার বন্ধ হ'য়ে গেল।

সিন্ধুবাসিনী তাকে সারাদিন একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখলেন। অনেক কটু কথা বললেন। এমন জানলে নাকি তার জন্মের মুহূর্তে নুন খাওয়ান হ'তো।

লীলাবতীও শুনলেন, কিন্তু এত বড় মেয়েটাকে কি বলে ভর্ৎসনা ক'রবেন ভেবে পেলেন না।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আর্তনাদে বললেন, তোরা মরলিনি কেন, কি করতে পেটে এসেছিলি?

মিত্তির বাড়িতে এমন কলঙ্ক আর কখনো হয়নি।

প্রেম, ঢলানিপনা! বেশ্যাগিরি!

জাত-জন্ম আর রইল না। সিন্ধুবাসিনী গলায় দড়ি দিতে চাইলেন—বংশের মুখ পোড়াল পোড়ারমুখি।

রেখার চুলের মুঠি ধ'রে পিঠে কিল দিয়ে সিন্ধুবাসিনী কিছুতে শান্ত হতে পারলেন না, কেটে কুচি কুচি ক'রলেও তাঁর রাগ যাবার নয়।

নিজেকে তিনি একশবার শোনালেন, তাই বলি মেয়ে রাতদিন ছাদে ওঠেন কেন। পেটে পেটে এতখানি। চোখ দুটো গেলে দিতে হয়।

পরোক্ষে লীলাবতীকেও মেয়ের জন্যে শুনতে হলো।

বিইয়ে খালাস। একবার যদি লক্ষ্য রাখতে হয়। ধন্য মা!

যথা সময়ে পাঁচকড়িবাবুও শুনলেন মেয়ের কীর্তি।

রেগে তিনি আগুন হ'য়ে গেলেন।

সাতদিন মেয়ের অন্নজল বন্ধের হুকুম দিলেন।

পৈতৃক বন্দুকটা বার ক'রে এনে বললেন, কই সিন্ধু, দেখা তো কোন্ ছোঁড়াটা? গুলি করবো—

একটা খুনোখুনির কাণ্ড হয়ে যায় আর কি!

অনেক ক'রে সিন্ধুবাসিনী থামালেন। উল্টো উৎপত্তি।

মেয়ে যদি বদ হয়, কাকে তুমি শাসন ক'রবে? কার মুখ তুমি চাপা দেবে!

বড়-বাড়ি বলে আর লোকে ভয় করে না! যতসব ছোটলোকের কাণ্ড-কারখানা শুরু হয়েছে!

'ছোটলোকেরা' একদিন সকাল বেলা মিত্তির বাড়ি চড়াও হলো।

তারা পাঁচকড়িবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জটলা ক'রে হৈ-হৈ ক'রতে লাগলো।

বেশীর ভাগই পাড়ার নব্য ছোকরার দল।

পাঁচকড়িবাবু কিছুই জানেন না।

তিনি তখন আপন দুর্গে নিশ্চিন্তে অবস্থান করছেন।

বাইরে যে এত কাণ্ড হচ্ছে তা তাঁর জানবার কথা নয়।

চিরাচরিত সদর দরজাটা বন্ধ ছিল। বেলা ন'টা পর্যন্ত বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের কোন দরকারই হয় নি। কোন খাতক বা মহাজন তখনো

এসে দরজায় দাঁড়ায়নি। বাইরের সঙ্গে হিসাব নিকাশের কোন সুযোগ হয়নি তখনো পর্যন্ত।

হল্লার দলটা ক্রমে এগিয়ে এল।

বড়-বাড়ির সদর দরজার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কয়েকটা অশ্লীল মন্তব্য ক'রলে। দু'একজন চেঁচালে গলা তেড়ে।

তাতেও যখন দরজা খুললো না, তখন তারা রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথের ওপর উঠে জটলা ক'রতে লাগল।

কেউ কেউ দরজায় ঘা দেবার জন্যে এগিয়ে এল।

ঠিক সেই সময় গাড়ি ক'রে সুকুমার এসে হাজির হ'লো।

কি ব্যাপার?

গাড়ির হর্ণ বাজিয়ে ভিড় সরাবার চেষ্টা ক'রলে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকটা বিরূপ মন্তব্য হলো—ঐ এসেছে রে!

গাড়ি থেকে নেমে সুকুমার ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা ক'রলে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস ক'রলে, আপনারা এখানে ভিড় ক'রছেন কেন? কি হয়েছে?

চেঁচামেচির মধ্যে কেবল এইটুকু বোঝা গেল—ভিড়টা বড়-বাড়িকে লক্ষ্য ক'রে এবং বিশেস একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সামনাসামনি বোঝা-পড়ার জন্যে। বড়-বাড়ি বলে পার পাবে না।

পাঁচকড়িবাবু পাড়ার বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে অপমান করেছেন।

কথা না বাড়িয়ে সুকুমার বললে, বেশ চেঁচামেচির দরকার কি, যিনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তিনি আমার সঙ্গে আসুন—মীমাংসা করা যাবে। আপনারা যান।

তাতে হল্লার দল রাজী নয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও এগিয়ে আসতে নারাজ। তারা এখানে দাঁড়িয়ে এইভাবে হল্লা ক'রবে যতক্ষণ না ঐ বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এসে সবার সামনে মাপ চাইবেন।

সুকুমার চটে উঠলো, তার মানে আপনারা গলার জোরে জিততে চান?

ভদ্রলোকের বাড়ির সামনে হল্লা করবেন ? কেন ?

কেন ? অত কথায় আপনার দরকার কি ? আপনি কে মশাই ?

পাড়ার নব্য ছোকরারা উত্তেজিত হ'য়ে গোলমাল আরও বাড়ালে, সমানে চেঁচামেচি ক'রলে।

গাড়ি নিয়ে আপনি সরে যান বলচি, নইলে—

সুকুমারও সমান তালে গর্জন ক'রে উঠলো, কেন, কি করবেন ?

ভেঙে গুড়িয়ে দেব। মনে করেন কিছু বুঝি না আমরা ? গাড়ি নিয়ে ইয়ার্কি মারা বার করে দেব।

ঘটনা ক্রমে ঘোরাল হ'য়ে উঠলো।

আশপাশ থেকে দু'একটি ইঁট-পাটকেল পড়বারও উপক্রম হ'লো।

এখন হল্লার যত আক্রোশ সুকুমারের গাড়িটার উপর।

হঠাৎ বড়-বাড়ির দরজা খুলে গেল।

পাঁচকড়িবাবু কাশ্মীরি আলোয়ান জড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে ভিড়টাকে লক্ষ্য ক'রতে লাগলেন।

সকালবেলা তাঁর বাড়ির সামনে একি ব্যাপার—আর সুকুমারই বা এর মধ্যে কেন ?

পাঁচকড়িবাবুকে দেখে ভিড় স্তব্ধ হ'য়ে গেছে।

যাঁকে তারা চাইছিল তিনি স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। আর যেন তাদের বলবার কিছু নেই।

সুকুমার বললে, বলুন কি আপনাদের বক্তব্য। ঐ তো উনি এসেছেন—

সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রতে লাগল।

পাঁচকড়িবাবু দোর গোড়া থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে সুকুমার ? এঁরা কি চান ?

আপনি সুরেশবাবুকে কি বলেচেন ?

কোন্ সুরেশবাবু ?

কেন, চেনেন না, আপনার পাশের বাড়ি ?

না।

না চিনুন, কাল তাঁকে আপনি কি বলেচেন ?

কিছু না, আমি তাঁকে চিনিই না।

বড়-বাড়ি বলে আপনাকেও কেউ চিনে বসে নেই, জানবেন। কি বলেচেন ?

কিছু না।

মিছে কথা। আলবৎ বলেচেন।

আপনারা মিছে কথা বলচেন।

আপনিই মিছে কথা বলচেন। বলেননি, তাঁর বাড়ি থেকে আপনার বাড়ির ছাদে কি সব হয় ?

পাঁচকড়িবাবু চুপ ক'রে রইলেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে।

তাঁর ছেলেকে জড়াননি এই ব্যাপারে ? বেচারি ইনোসেন্ট।

না।

না ? তা হ'লে কথা উঠলো কেন ? সুরেশবাবু অমন মিথ্যে বলেন না।

আমিও মিথ্যে বলি না।

আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্চি, পাড়ার ভদ্রলোকদের কখনো ঘাটাবেন না। পাড়ায় বাস ক'রতে যদি চান, সবার সঙ্গে ভদ্রভাবে মিশবেন। আপনার বড় বাড়ি দেখে কেউ ভয় করে না, বুঝচেন ?

পাঁচকড়িবাবু চুপ ক'রে রইলেন, যেন সব অপরাধ তাঁরই।

প্রতিবাদ করা মানে নিজেকে আরো ছোট করা। কিছুতেই তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না, কে সুরেশবাবু এবং কে তাঁর ছেলে—কি-ই বা তাঁদের তাঁর বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ।

পাড়ায় আজকাল অনেক ভদ্রলোকের প্রাধান্য, সুতরাং তাঁকে চুপ ক'রে থাকতেই হবে। মুখ বুঝে সহ্য ক'রতে হবে অপমান।

ভিড় সরে যেতে সুকুমার পাঁচকড়িবাবুকে নিয়ে বাড়ির ভিতর এল।

বৈঠকখানায় খানিক চুপ ক'রে বসলে। ব্যাপারটা সত্যই রহস্যপূর্ণ। তবে এই রক্ষা, যতটা ইতরামী আশা ক'রেছিল, ততটা ঘটেনি। পাঁচকড়িবাবুর নিষ্ক্রিয়তায় উত্তেজিত জনতা আপনা থেকে শান্ত হ'য়ে গেছে।

সুকুমার যেন নতুন করে পাঁচকড়িবাবুর পরিচয় পেলে।

কি লোক, কি হ'য়ে গেছে। এককালে এই নফরকুণ্ডু রোডে তাঁর একাধিপত্য ছিল। বাড়ির সামনে দিয়ে কারো এতটুকু শব্দ ক'রে যাবার হুকুম ছিল না।

আজ একটা হল্লাই হ'য়ে গেল। যারা একদিন মিত্তির বাড়ির আনাচে-কানাচে থাকতো ভয়ে ভয়ে, তারা আজ সদরে এসে পাঁচ কথা শুনিয়ে গেল।

সস্তায় পুকুর ভরান জমি কিনে বাড়ি তুলে সব ভদ্রলোক হ'য়ে গেছে। যুদ্ধটা লেগে যেন সব কী হ'য়ে গেল!

চোখ তুলে চাইতে যেন পাঁচকড়িবাবুর লজ্জা হচ্ছিল।

আজ অকারণে যেন তিনি বড় ঘা খেয়েছেন। অযথা তাঁকে পাড়ার লোক অপমান ক'রে গেল। আজ তাঁর এমন ক্ষমতা নেই যে তিনি প্রতিবাদ করেন, কিছু বলেন।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, তোমাকে কি বলবো, এক তিলও এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। এই সব ছোটলোকদের কাণ্ডকারখানা। নিজের বাড়িতেও নিশ্চিন্তে থাকার উপায় নেই। শুনলে তো বেটাদের চোটপাট—পথেও হাগবে, আবার চোখও রাঙাবে।

সুকুমার জিজ্ঞেস ক'রলে, কি হ'য়েছিল?

হবে আর কি? আজকাল যা হ'চ্ছে।···বাড়ির বৌ-ঝিদের বাড়ির অন্তঃপুরে রেখেও শান্তি নেই। যেখানেই যাও ছোটলোকেরা ঠিক আছে! এ কী দিনকাল পড়লো!

ঠিক ব্যাপারটা সুকুমার বুঝতে পারে না।

চুপ করে থাকে।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, একটা খদ্দের দেখতো বাবা, এ বাড়ি আমি বেচে দেব! দেশের যে ভদ্রাসন আছে সেখানে গিয়ে বসবো। ইজ্জৎ যদি না রইল, তা হ'লে আর কিসের জন্যে থাকা? যত সব ছোটলোকের কাণ্ড আজকাল কলকাতায়!

খানিক চুপ ক'রে থেকে পাঁচকড়িবাবু বললেন, মেয়েগুলোর একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত শান্তি নেই। ওদেরও বয়েস হচ্ছে, কত আর ঢাকা দিয়ে রাখবো! একালের মত কিছুই ওদের ক'রতে দিইনি, তবু—

সুকুমার উৎসুকভাবে চেয়ে রইল।

রেখাকে নিয়ে যত গণ্ডগোল! আর রাখা চলবে না!

একসময় সুকুমার বাড়ির ভিতর এসে দেখলে, থমথমে ভাব।

আজ আর কেউ তাকে অভ্যর্থনা ক'রলে না। কারো সাড়া শব্দও পাওয়া গেল না। একটা শোকের ছায়া যেন চারদিকে।

খবর পেয়ে সিন্ধুবাসিনী এগিয়ে এলেন।

ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

যথারীতি জলখাবারের বন্দোবস্ত ক'রলেন। কুশল প্রশ্ন ক'রলেন।

মীরাকে আশেপাশে দেখা গেল না। শান্তা, শিপ্রা ক'বার যেন তাকে দূর থেকে লক্ষ্য ক'রে সরে গেল।

আজ মেয়েরা এমন ব্যবহার ক'রছে কেন?

খবরটা সিন্ধুবাসিনীই দিলেন।

সুকুমার শুনে চুপ ক'রে রইল।

কে জানে তার কি বলবার আছে এ ব্যাপারে।

ঠিক আবার অন্যায় বলেও কিছু মনে হ'লো না।

দোষ কি শুধু রেখার? তাঁরাই বা অনূঢ়া অরক্ষণীয়া কন্যাদের মনকে সুস্থ রাখতে কি চেষ্টা ক'রেছেন? রাতদিন খাঁচার মধ্যে পুরে রাখলেই কি কর্তব্য করা হ'য়ে গেল। খাঁচার দোর শক্ত ক'রে বন্ধ রাখলে কি হবে। কালক্রমে খাঁচার বেড়ায় ঘুণ ধরতে পারে। ছোট পাখির ঠোঁটের অবিরাম আঘাতে সে বেড়াও একদিন ভাঙতে পারে। ভেঙেছেও।

অন্যায় কি?

সময় মত মেয়েদের পাত্রস্থ করেন নি কেন? এতদিন তাঁরা কি করছিলেন?

সিন্ধুবাসিনী দুঃখ ক'রলেন, পোড়া দেশে কি ছেলে পাওয়া যায়। যা আসে তাও আবার তেমনি। আগে থেকে এককাঁড়ি চেয়ে আছে।

সুকুমার বললে, ওর মধ্যে দেখে শুনে দিতে পারতেন।

সিন্ধুবাসিনী অবাক হন, কি বলচিস তুই সুকু। দেখলে শুনলে তোরও প্রবৃত্তি হবে না। দেখেছিলি তো বড়খুকীর বিয়েটা?

সবার যে সুধার মত ঘর বর হবে তার মানে কি।

কেমন যেন আজ সুকুমারের মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে। আজও এঁদের কথার মধ্যে সেই ঝাঁজ। এদিকে অবস্থা তো জানতে বাকি নেই। ঘড়ার জল তো শেষ হ'য়ে এসেছে।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, তা না হোক, এঁদের যোগ্য তো হওয়া চাই। মিত্তির বাড়ির নাম কে না জানে? যাকে তাকে ধরে দিলে তো হবে না।

এসব যুক্তির উত্তরে সুকুমার কি বলবে ভেবে পায় না।

এখনো সেই আভিজাত্য, নাম-ডাকের মোহ। কালের ধর্মের সঙ্গে যদি

এঁরা মিশতে না চান কে কি বলতে পারে। মিথ্যে এঁদের যুগ-ধর্মের কথা বোঝাবার চেষ্টা। ভাঙলেও এঁরা মচ্‌কাবেন না কোন মতে।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, তুই দেখিস না সুকু।—তোর তো কত লোকের সঙ্গে জানা-শোনা। বোনেদের জন্যে না হয় একটু কষ্ট করলি। দেখচিস তো তোর মামাকে।

সুকুমার মাথা নাড়লে।

জানে, এসব কথার কোন গুরুত্ব নেই।

হ'তে পারে সে উপার্জন ক্ষমতায় এঁদের কাছে আজ বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু তাই বলে এঁদের মর্যাদা রক্ষা করবার কোন যোগ্যতাই তার হয় নি।

আজ সুকুমার যে ভাবেই এঁদের দেখুক, যত অধঃপতনের কথাই ভাবুক—এঁরা এখনো তাকে করুণার চক্ষেই দেখেন।

সুকুমার মনে মনে জানে, তার আনা কোন সম্বন্ধই সিন্ধুবাসিনীর মনঃপুত হবে না, পাঁচকড়িবাবু পছন্দ ক'রবেন না। উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া পর্যন্ত মেয়েগুলোকে অপেক্ষা করতে হবে—শিবপুজো, লক্ষ্মীপুজো, সত্যনারায়ণ, বারব্রতয় ভুলে থাকতে হবে।

অনেক বসন্ত বৃথাই যাবে।

মেয়েগুলোর জন্যেই দুঃখ হয় সুকুমারের।

সম্ভব হ'লে সে বুঝি এদের জন্যে সব কিছু ক'রতে পারে। কিন্তু—

ভিতর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঝের বাড়ির উঠান পেরিয়ে নির্জন চলনের পথটায় প'ড়তে মনে হ'লো পাশ থেকে কে যেন উঁকি মারছে।

সুকুমার থমকে দাঁড়ালে—চারদিক চেয়ে দেখলে।

না, তার মনের ভুল—কেউ নেই।

মনে হ'লো, পাঁচকড়িমামা কি নির্বোধ, এই বাজারে এমন বাড়িটা মিথ্যে

মিথ্যে ফেলে রেখেছেন—ভেঙে-চুরে, অদল-বদল ক'রে নিলে কত ঘর ভাড়াটে বসাতে পারতেন সচ্ছন্দে। মোটা-মোটা ভাড়া পেতেন।

তা নয়, আভিজাত্য—বাড়ি ভাড়া দেব না, বাইরের জঞ্জাল ঘরে ঢোকাব না। তিনপুরুষ তাঁরা ভবানীপুরে আছেন, কে কত বাড়ি ভাড়া দিয়ে বড়লোক হ'য়েছেন। ও উঞ্ছবৃত্তি।

মরুকগে পরের ভাবনায় তার লাভ কি।

ওঁদের বাড়িঘর ওঁরা বুঝবেন।

ভুল নয়, পাশের ঘর থেকে মূর্তিটি সামনে এগিয়ে এল।

সুকুমার দেখলে, শিপ্রা।

সুকুমার জিজ্ঞেস করলে, কি রে?

শিপ্রা হাতের চিঠিটা টপ্ ক'রে সুকুমারের সামনে ফেলে দিয়ে কোথা দিয়ে যেন মুহূর্তে অন্তর্ধান হয়ে গেল।

বড় বিস্ময় বোধ করলে সুকুমার। এ আবার কি?

একে সকাল বেলার ঐ ব্যাপার, তার ওপর এসব কি? মেয়েগুলো কি মনে ক'রেছে?

চিঠিটা নিভৃতে কুড়িয়ে নিতেও যেন কেমন ভয় করলো সুকুমারের। রুচিতে বাধলো। হাজার হোক তাকে সবাই বিশ্বাস করে। এবাড়ির সে আত্মীয়—সম্পর্ক যতই দূর হোক এমন একটা গর্হিত কাজ সে কিছুতেই করতে পারবে না।

দুপা এগিয়ে গিয়ে সুকুমার আবার ফিরে এল।

সে চিঠিটা উপস্থিত না নিলেও চিঠিটা আর কারো হাতে পড়লে ফল ভাল হবে না। যে-নোংরামীর ভয়টা ক'রছে সুকুমার, হয়তো তার অবর্তমানেই সেটা ঘটবে এবং যে চিঠি লিখেছে তার নির্যাতনের একশেষ হবে।

কোনো দিক থেকে নিজেকে সুকুমার সমর্থন ক'রতে পারছে না।

চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে সুকুমার দম বন্ধ ক'রে বাইরে বেরিয়ে এল।

মনে হ'লো তার পিছনে পিছনে অনেকগুলো চোখ যেন তাকে লক্ষ্য ক'রছে। চিঠিটা খুললেই সে ধরা পড়ে যাবে।

নফরকুণ্ডু রোড থেকে গাড়িটা বার ক'রে সুকুমার চিঠিটা খুলে দেখলে।

তার মুখের ওপর কে যেন প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারলে।

সামান্য দু'চার কথায় মীরা তাকে তাদের বাড়িতে আসতে নিষেধ ক'রেছে। কোন কারণ অবশ্য দেখায় নি, এমনি না আসতে অনুরোধ ক'রেছে কেবল। কেন জানি না, সুকুমারের মনে হ'লো সকাল বেলার ব্যাপারের সঙ্গে মীরার এই নিষেধের যেন কোন সম্পর্ক আছে।

তার এই হঠাৎ আসা-যাওয়া নিয়ে নিশ্চয়ই কোন কথা উঠেছে!

কিন্তু কেন?

কারো কোন কথার সে ধার ধারে না, মীরা কি জানে না?

সত্যি যদি তার আসাটা মীরা পছন্দ না করে স্পষ্ট মুখে বললেই পারতো। অমন চিঠি লিখে অপমান ক'রলে কেন?

মনে হচ্ছে পাড়ার চেঙড়া ছোঁড়ার দলটা তার পিছনে পিছনে হৈ-হৈ ক'রতে ক'রতে ছুটে আসছে। তার নামের সঙ্গে মীরার নাম যোগ ক'রে অশ্লীল মন্তব্য করছে!

পাঁচকড়িমামা, সিন্ধুবাসিনী দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হ'য়ে যেন সব লক্ষ্য ক'রছেন।

সুকুমার ঘোরতর সর্বনাশ ক'রেছে তাঁদের। তাঁদের মান, সম্ভ্রম, মর্যাদা সুকুমারই নষ্ট ক'রেছে।

কিন্তু মীরার দিক থেকে কি কোন সন্দেহের উদ্রেক হ'য়েছে—সুকুমার তার কোন ক্ষতি করতে পারে?

শুধু শুধু নিশ্চয়ই চিঠিটা সে লেখেনি।

মীরা সম্পর্কে সুকুমারের কোন দুর্বলতা আছে কি? কই, তার প্রকাশ

তো কোন দিন সুকুমারের দিক থেকে কিছু হয় নি।

সে কথা সুধা বলতে পারে। কিন্তু সে-তো একরকম বিস্মৃতির গহ্বরে।

প্রথম দিনের সাক্ষাতে সুধাই বরং সে স্মৃতিমন্থন ক'রতে চেষ্টা করেছিল। সুকুমার আমল দেয়নি।

স্মৃতি-বিলাসে সুকুমারের মত প্রৌঢ় ব্যক্তির কাজ কি।

চিঠিটা সুকুমার বার বার খুলে খুলে দেখেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলে না।

এক সময় তার বড় অভিমান হ'লো, বড়-বাড়ির মেয়ে বলে এমনি অযথা আঘাত মীরা তাকে করতে সাহস করলে—তার মূল্যকে তৃণের মত জ্ঞান করলে!

বড় অহঙ্কার, বড় তেজ ঐ বড়-বাড়ির মেয়ে মীরার।

নন্দকুণ্ডু রোডের ব্যাপারটা এইখানেই চুকে বুকে যেতে পারতো। সুকুমারের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই থাকতো না।

জন্মমৃত্যু বিবাহের অমোঘ বিধানে পাঁচকড়িবাবু একদিন না একদিন তাঁর কন্যাদের জন্যে উপযুক্ত পাত্র সন্ধান ক'রে নিতেন। সুকুমার একদিন যেমন অকস্মাৎ এসেছিল, তেমনি আবার অকস্মাৎ-ই চলে যেত।

কারো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হ'তো না।

কিন্তু ঐ মীরাই আবার সব গণ্ডগোল ক'রে দিলে।

কোথা থেকে কিভাবে যেন সন্ধান করে বাড়ির চাকরকে একদিন সুকুমারের কাছে পাঠালে।

চিঠিতে আর কিছু লেখা ছিল না—কেবল অবিলম্বে আসবার অনুরোধ ছিল।

হোক অনুরোধ।

সুকুমার আর ওমুখো হবে না।

পুরোন চাকর রামা অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেছিল।

কোন একটা জবাব না নিয়ে বুঝি সে নড়বে না।

সুকুমার তাকে বাড়ি যাবার জন্যে বললে, তুই দাঁড়িয়ে কেন?

রামা বললে, তুমি আসিবিনি?

সুকুমার স্পষ্ট কোন জবাব দিলে না। বললে, তুই যা।

এ ডাকের কি মানে হয়?

সুকুমারের মূল্য কি এতই তুচ্ছ, যখন খুশি ডাকলে সে বর্তে যাবে?

সে কারো চাকর নয়, কারো আজ্ঞাবহ দাস নয়। চিরকাল মানুষের সমান যায় না, চিরকাল মানুষের মনোভাব এক থাকে না। আকর্ষণ কোন কিছুর চিরস্থায়ী নয়।

তাছাড়া নিজের কাজ আছে মানুষের। অমন কত বড়-বাড়ির কাহিনী মানুষকে ভুলে থাকতে হয়! কিছু আসে যায় না।

না কোন সম্বন্ধ নেই।

কোন অধিকার নেই ইচ্ছে মত সুকুমারকে ডেকে পাঠাবার। পিসিমার ভাসুর পো। অনেক দূর, অনেক পর।

সুকুমার স্থির করলে, যাবে না।

আবার ডাকবার জন্যে লোক এলে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেবে—রামা ই হোক, আর যেই হোক।

মনে মনে সুকুমার আত্মপ্রসাদে হেসে ওঠে।

এ ডাকার অর্থ যে সে বুঝতে না পারে, এমন বোকা নয়। এখন সুকুমারকে দিয়ে যদি কোন উপকার হয়। সুকুমার বড়লোক হ'য়েছে। তাই আজ তাকে প্রয়োজন।

নিজের ভুলটা মীরা ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বলে সংশোধন ক'রে নিতে চায়। সুকুদা তুমি রাগ করোনা, মাথার ঠিক ছিল না।

অনেক ন্যাকামি সুকুমারের দেখা আছে।

নিশ্চয় মেজকাকী মীরাকে পরামর্শ দিয়েছেন। আড়ালে ভৎর্সনা করেছেন। সুকুমার মৃতদার হলেও এমন কিছু ফেলনা নয়।

কিন্তু মনের সঙ্গে সুকুমার সঠিক বোঝাপড়া ক'রতে পারে না।

একবার মনে হয়, গিয়ে এবার দেখবে—মুখোমুখি মীরাকে সেদিনের চিঠির জন্যে কৈফিয়ৎ চাইবে—কেন আসতে নিষেধ করেছিল সে? যদি সম্ভব হয় মীরার সমস্ত অহঙ্কার নিজ হাতে চূর্ণ ক'রে দেবে। মীরা সত্যিকারের অনুতপ্ত হ'য়ে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রবে।

যাবো না যাবো না ক'রে সুকুমার একদিন সন্ধ্যেবেলায় নফর কুণ্ডু রোডে মীরাদের বাড়ি এল।

সদর দরজার সামনে আসতে কেমন যেন অদ্ভুত ভাব হ'লো মনের। মনে হ'লো ফিরে যায়—ঐ পাতালপুরীতে আর প্রবেশ করবে না। পাতাল কন্যাদের কোন সংবাদ নেবে না।

বৈঠকখানা ঘরে পাঁচকড়িমামা বসেছিলেন।

একটা বড় বাঁধান খাতা উল্টে উল্টে কি যেন মন দিয়ে দেখছিলেন।

বড় ঘড়িটা মনে হ'লো যেন বন্ধ।

সাড়া পেয়ে পাঁচকড়িবাবু বললেন, কে সুকুমার? তারপর খবর ভাল তো সব? অনেক দিন আসনি এদিকে!

সুকুমার মাথা নাড়লে। সময় পায়নি।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, যাও, ভেতরে যাও—তোমার কাকী আছেন।

সংবাদটা বাহুল্য।

সুকুমার দাঁড়িয়ে রইল, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে যাওয়াটা যেন কেমন দেখায়!

হঠাৎ নিজের মনে পাঁচকড়িবাবু বললেন, লোকে বলে মেয়েদের বিয়ে দাও না কেন? সাধে আর দিই না! দিয়ে কি হবে?…শেষ পর্যন্ত ঘাড়ে এসে পড়বে। যে বেটারাই আসে ছেলের সম্বন্ধের জন্যে, খবর নিয়ে দেখো সবার ভাঁড়ে মা ভবানী! ছেলের বিয়ে দিয়ে রাজত্ব লাভ ক'রবে। সিন্ধুকে বলেচি, দেব না মেয়ের বিয়ে…দেখি কোন্ বেটা কি করতে পারে!…জাত যাবে? এক ঘরে করবে? করুক।

খানিক থেমে পাঁচকড়িমামা অদ্ভুত অট্টহাসি ক'রলেন।

ওসব আজকাল নেই, কে কার খবর রাখছে! তুমিও যেমন, কে কোথায় ভেসে যায় তার নেই ঠিক!

ঠিক পাগল হ'য়ে গেছেন পাঁচকড়িমামা, না হ'লে এমন যা তা বলেন। এই ক'দিনে যেন আরো অথর্ব হ'য়ে পড়েছেন। মানসিক স্থৈর্য নেই। মিছে রাগ করা ভদ্রলোকের ওপর।

সুকুমার কি ভেবে বললে, আমার হাতে একটা ভাল ছেলে আছে—

পাঁচকড়িমামা গা-ই করলেন না।

মুখে মেয়ের বিয়ের কথা বললেও, মনে তাঁর সে সম্বন্ধে কোন বিকার নেই। বললেন, ভাল তো!

বলেই আবার খাতার পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

সুকুমার ক্ষুন্ন হ'লো।

সুধাকে দেখে সুকুমার অবাক হ'লো।

সেই দেখেছিল আর এই দেখছে, মাঝখানে ক'টি মাসের ব্যবধান!

কিন্তু এতেই মানুষের কি পরিবর্তন হয়! সুধার শরীর আধখানা হ'য়ে গেছে—স্বামীসৌভাগ্যবতীর চাকচিক্য নেই। পোশাক পরিচ্ছদেরও সে আড়ম্বর নেই।

কালো রঙ আরো কালো হ'য়েছে।

আরো অবাক হ'লো সুকুমার সুধা তাকে দেখেও যখন কোন সম্ভাষণ করলে না। যেন সুধা তাকে চেনে না।

মাঝের বাড়ির উঠানটায় মরা নারকেল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে কেমন একরকম ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে সুধা দাঁড়িয়েছিল। কে জানে এই বয়েসে আকাশে তারা গোনার তার শখ হ'য়েছে কি না।

সুকুমার থমকে দাঁড়াল।

সুধার কোন খেয়াল নেই, তেমনি নীরস তরুর মত দাঁড়িয়ে।

সুকুমার ডাকলে, সুধা! কি ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে? কবে এলে?

মরা চোখের চাওয়ার মত একবার সুধা চেয়ে দেখলে, নিমেষমাত্র।

আবার তেমনি আকাশে চোখ তুলে দাঁড়িয়ে রইল।

চিত্রার্পিত।

সুকুমার কাছে সরে এল।

চুপি চুপি ডাকলে, সুধা! সুধা! কি হয়েচে তোমার?

সুধা নিঃশব্দে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

অদ্ভুত মূক বেদনায় কাতর মুখটা।

সুকুমার খানিক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ইতিকর্ত্তব্য স্থির ক'রতে পারলে না।

হঠাৎ এ আবার কি ভাব সুধার। মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি?

আজ সব যেন কেমন বিপরীত মনে হচ্ছে বড়-বাড়ির। সদরে পাঁচকড়ি-মামার ঐ ধরন, এখানে সুধার এই!

এই জন্যেই কি মীরা তাকে ডেকে পাঠিয়েছে?

কিন্তু সে এসে এ সবের কি ক'রবে ?

চকিতে পাঁচকড়িমামার কথাগুলো স্থকুমারের মনে পড়ল—কেন তিনি কন্যাদের পাত্রের জন্য বিচলিত নন। কোন সম্বন্ধই কেন তাঁর মনঃপুত নয়।

কোথায় যেন একটা বেদনা নিঃশব্দে সঞ্চারিত হয়।

এই বাড়ির সঙ্গে কবে যেন স্থকুমারের একটা গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়ে গেছে। এদের ভাল-মন্দে তার অনেক কিছু যায় আসে। এতকাল হয়তো এদের সে ভুলই বুঝে এসেছে। এঁরা তাকে ঘৃণা করে না।

স্থকুমার স্থধার হাত দুটো ধরে নাড়া দিলে, স্থধা! স্থধা! কথা বলচো না কেন? কি হ'য়েচে তোমার?

বুক ফেটে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল যেন।

স্থধা অস্ফুটে বললে, স্থকুদা। কখন এলে তুমি?

স্থকুমার বললে, চল, ভেতরে যাই।

একান্ত বাধ্য যেন।

স্থধা পিছন পিছন এগিয়ে এল।

অন্দরমহলের পথের ঘরটায় এসে হঠাৎ স্থধা কোথায় হারিয়ে গেল যেন।

স্থকুমার পিছন ফিরে দেখলে স্থধা নেই।

দেখা হ'তে সিন্ধুবাসিনী চোখ মুছলেন।

কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন, এ কি হ'লো স্থকু?

বিস্ময়ের স্থকুমারের সীমা পরিসীমা নেই আজ।

সত্যিকারের কি হ'য়েছে, সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, তুই ঘরের ছেলে তোকে বলতে লজ্জা নেই। বিশ্বনাথ আমাদের মুখে কালি দিয়েছে।

তখনো স্থকুমারের বিস্ময় কাটেনি।

নীরবে সিন্ধুবাসিনীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, অত বড় ঘরের ছেলে, অত বড় বংশ।...শেষে একি করলে। কোন কুলে আর মুখ দেখাবার উপায় নেই......

হঠাৎ যেন মনে পড়েছে, সিন্ধুবাসিনী জিজ্ঞেস করলেন, সুধাকে দেখলি আসবার সময়?

সুকুমার মাথা নাড়লে।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, মেয়েটার কি জ্বালা বল্ দিকি। ভগবান ওর কপালে কেন এমন করলেন! সব ঘুচে যাবার কি ওর বয়েস?

শুনে সুকুমার মনে মনে চমকে উঠলো, তা হ'লে সত্যিকারের কিছু হ'য়েচে নাকি বিশ্বনাথবাবুর?

সিন্ধুবাসিনী বললেন, ওর চেয়ে বিয়ে না হ'য়েচে এদের ভাল আছে। কার ঘরে পড়ে কি হ'তো কে জানে। অমন ঘরও যদি পুড়ে যায়।

সুকুমার এবার স্পষ্ট জিজ্ঞেস ক'রলে, কি হ'য়েচে বিশ্বনাথবাবুর?

রুদ্ধ কণ্ঠে সিন্ধুবাসিনী বললেন, তুই ঘরের ছেলে তোকে বলতে লজ্জা নেই—বাছা আমার জেলে গেচে।

কেন? সুকুমার আঁৎকে উঠলো।

শেয়ার-মেয়ার কি সব করতো; আমি জিজ্ঞেস করি, তোর দরকার কি যে ঐসব করতে গেলি। কতকগুলো জোচ্চোরের সঙ্গে মিশে—

সিন্ধুবাসিনী হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

সুধা এসে দোর গোড়ায় দাঁড়াল।

আদর ক'রে সিন্ধুবাসিনী বললেন, আয়। কোথায় ছিলি এতক্ষণ? চুলটা পর্যন্ত বাঁধলি না আজ?

একেবারে স্বাভাবিক মানুষ সুধা।

সুকুমারকে জিজ্ঞেস করলে, কখন এলে সুকুদা? খুব মানুষ যা হোক, আর একদিনও দেখা করলে না। ভাগ্যি এসেছিলুম তাই তোমায় দেখা হ'লো।

সুকুমার হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না।

কার বাড়িতে কোথায় গিয়ে দেখা করবে, তা কি সুধা ভেবে দেখেছে কোনদিন ?

সিন্ধুবাসিনী কালবিলম্ব না করে কেশপ্রসাধনের সরঞ্জাম নিয়ে সুধার পিছনে এসে দাঁড়ালেন।

তুই এখানে বসে তোর সুকুদার সঙ্গে গল্প কর, আমি ততক্ষণ চুলটা বেঁধে দিই। কি ছিরি হ'য়েছে চুলের।

সুধা কোন খেয়ালই ক'রলে না।

যেমন এসেছিল তেমনি আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাগল না হ'লে এমন বিচিত্র ব্যবহার কেউ করে না।

যাবার আগে মাথার ঘোমটা সে তুলে দিলে। হঠাৎ লজ্জাবনতা মনে হ'লো তাকে।

সিন্ধুবাসিনী বললেন, দেখলি তো ? ঐ মেয়েকে নিয়ে হয়েছে এক জ্বালা ! কি করি, কোথায় রাখি বুঝতে পারি না। সময় সময় কি মনে হয় জানিস সুকু, মৃত্যুটা আমার আগে হ'লো না কেন—কবে তো সব খেয়ে বসে আছি !

এ দুঃখের কি সমবেদনা সুকুমার জানাবে ভেবে পেল না।

নিজেরই দুঃখের কি তার শেষ আছে !

আজ নিজের কৃতিত্বটা তার নিজের কাছে পরিহাসের ব্যঙ্গের মত মনে হচ্ছে।

মনের গোপন ইচ্ছেটা বড় বিকৃত ভাবে মনের কাছে ধরা পড়েছে।

আজ তাকে বাহাদুরী দেবার মত সুস্থ কেউ নেই বড়-বাড়িতে। তার যোগ্যতা বুঝবে কে ?

সিন্ধুবাসিনী বললেন, তুই বস, আমি আসচি—দেখি আবার মেয়েটা গেল কোথায় ! রাজরাণী আমার ভিখারিণী হয়েছে রে !

বুকফাটা কান্নার মত শোনায় সিন্ধুবাসিনীর আক্ষেপটা।

বড় ভেঙে পড়েছেন তিনি।

কিন্তু সত্যি কি সুধা পাগলিনী হয়েছে? এত ভেঙে পড়বার কি আছে? বড়লোকেরা অমন জেলে যায়, জালিয়াতী করে, তা বলে তাদের স্ত্রীরা এমনি করে?

একটু বাড়াবাড়ি ক'রছে সুধা—আদিখ্যেতা!

সুধার আজকের ব্যবহারে সুকুমারের কোথায় যেন লাগে।

এমনি বুঝি আর একদিন সুকুমারের লেগেছিল। সুধা দিব্যি হাসি মুখে স্বামী-গৃহে গিয়েছিল সেদিন।

বেশ হ'য়েছে, ঠিক হ'য়েছে!

বড়লোকের ঘরণী হবে না?

মুখে সুকুদা, সুকুদা করলে কি হবে, মনে মনে সুধা নিশ্চয়ই তাকে করুণাই ক'রতো—বড় গরীব সুকুদারা!

মাথা নীচু ক'রে মনটাকে হৃদয়ের আরো গভীরে নামিয়ে দেয় সুকুমার। কত আলো, কত সুখ সেখানে যেন। হয়তো একটু আঘাতের চিহ্ন আছে, অভিমানের ব্যথা একটু জমে আছে। কিন্তু তুলনায় সে কিছু নয়। আলো-আঁধারের সে রাজত্বটা অনেক অনেক ভালো, আজকের তুলনায়।

সুকুদা!

মীরার গলা যেন।

সুকুমার চমকে উঠলো।

কই, কেউ নয় তো।

স্বপ্ন দেখা বুঝি এমনি করেই ভেঙে যায়।

নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পায়।

উঠে সুকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে দালানের উপর এল।

এখান থেকে অনেকগুলো ঘর দেখা যায় বাড়িটার। সব ঘরে আজ আলো জ্বলেনি।

কে জ্বালাবে? সিন্ধুবাসিনী সুধাকে নিয়েই ব্যস্ত। লীলাবতীর কথা বাদ দেওয়াই উচিত—তিনি ওসবের মধ্যে নেই, আলো-অন্ধকার তার কাছে সমানই। 'ডাকসাইটে' সুন্দরী বউ চেয়েছিল বড়-বাড়ি—অনেক খুঁজে লীলাবতীকে পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর কাছে আর কিছু প্রত্যাশা নেই কারো। নিজের সৌন্দর্য দিয়ে তিনি বড়-বাড়িকে যেন অতিশয় নিরাশ করেছেন।

সুকুমার গুটি গুটি এগিয়ে এল।

তিন মহলা বাড়িটা আজ যেন বড় নির্জন। প্রতিপদক্ষেপের প্রতিধ্বনিটা বড় বেয়াড়া হ'য়ে সুকুমারের কানে বাজতে লাগল।

পা টিপে টিপে যেন চলা-ফেরা করা উচিত ছিল—বড় অভদ্রের মত নিজের অস্তিত্বটা সুকুমার জাহির করছে।

ছেলেমানুষের মত হাতের কাছে সব সুইচগুলো টিপে টিপে সুকুমার এগুতে লাগল।

বড় অন্ধকার আজ বড়-বাড়িটায়। একলা-একলা ঘুরে দেখতে সত্যিই ভয় করে।

সেই গল্পটা সুকুমারের মনে পড়ে—কোন্ দেশের এক রাজপুত্র যেন কোন্ এক রাজকুমারীকে উদ্ধার করবার ব্রত নিয়েছিল। কত দেশ ঘুরে ঘুরে শেষে এমন এক দেশে এল যেখানে মানুষজন নেই কিন্তু মানুষের সব কীর্তিই ঘরে ঘরে সাজান আছে। হাট আছে, বাজার আছে, রাস্তা আছে, ঘাট আছে, দেবালয় আছে, মন্দির আছে—মানুষ নেই কেবল। রাজপুরীও আছে। কেউ-নেই রাজত্বে। রাজপুরীটা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত খাড়া আছে। ইষ্টলাভের আশায় রাজকুমার রাজপুরীতে প্রবেশ ক'রলো—এখানেও সেই, ঘরে ঘরে খাট, পালঙ্ক, বিছানা, জিনিসপত্র বোবা বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে।

মীরার শুধু শুধু ডেকে পাঠাবার কোন মানে হয় না।

এতক্ষণে একবারও কি দেখা ক'রতে নেই, এতই যদি প্রয়োজন ছিল?

যেমন বাড়ি, মেয়েগুলো তেমনি নন্দদুলালী—কি যে বোঝে, কি যে ভাবে কে জানে। এখনো ছেলেমানুষী সব তাতে। বিয়ে দিলে কবে সাত ছেলের মা হ'য়ে যেত।

একটা কঠিন কথা সুকুমারের মুখ দিয়ে বার হ'তে চায়—একটা বিরূপ মন্তব্য বুঝি সে ক'রতে চায় বড়-বাড়ির সব মেয়েদের সম্বন্ধে। যেমন সুধা তেমনি মীরা, তেমনি রেখা, তেমনি সব।

সুকুদা!

পিছন থেকে ডাক শুনে সুকুমার ঘুরে দাঁড়াল।

ভিতর-বাড়ি থেকে বাইরে বেরোবার মার্বেল-পাথর বাঁধান পথটা বড় সঙ্কীর্ণ।

শব্দটা দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে সামনে এগিয়ে গেল।

মীরা, কি ব্যাপার?

কোন উত্তর দিলে না মীরা। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

সুকুমার জিজ্ঞেস করলে, কিছু বলবে?

মীরা বললে, এখনি চলে যাবেন?

আবার সেই আপনি সম্বোধন।

সুকুমার বললে, হাঁ।

একটু বসবেন না। কাকুতি ভরা মীরার কণ্ঠস্বর।

অনেকক্ষণ তো বসলুম, আর কত বসবো? কাজকর্ম আমাদেরও আছে।

একটু কর্কশ শোনাল সুকুমারের কণ্ঠস্বর।

তবে থাক। ব্যথিত স্বরে মীরা বললে, আবার আসবেন।

রূঢ়স্বরে সুকুমার বললে, আর আসবো না।

মীরা চুপ ক'রে রইল।

স্বইচ্ছায় সুকুমার যদি আর না আসে তার বলবার কি আছে। কি সম্পর্ক তাদের সঙ্গে?

কি মনে হ'লো সুকুমারের। কাছে সরে এসে সোহাগের সুরে বললে, সত্যিই কি তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও মীরা? যদি চাও, তাহ'লে এমন কর কেন? বল, আমি তোমার কি করতে পারি।

মীরার দুই গণ্ড অশ্রুসিক্ত হ'য়ে গেছে।

কিছু না, কিছু না—এ লজ্জার কথা কাউকে বলা যায় না।

স্তব্ধ হ'য়ে সুকুমার দাঁড়িয়ে রইল।

কে জানে কোন অন্যায় সে করলো কিনা, কোন অসম্মান হ'লো কিনা।

মীরা বললে, রেখার জন্যে তোমাকে ডেকেছিলুম। সবাই মিলে কি নির্যাতন করছে মেয়েটার। সে সময় পিসিমাকে তুমি যদি বুঝিয়ে বলতে। কোনটে অপরাধ সুকুদা—আজীবন কুমারী থাকা, না স্বয়ম্বরা হওয়া? রেখা বাবার মুখের ওপর তর্ক করেছিল—কি শিখিয়েচো তোমরা আমাদের যে তোমাদের মুখ উজ্জল করবো? কেবল বলেচো এটা করিসনি, ওটা করিসনি—এটা দেখিসনি, ওটা দেখিসনি। কেন? আজ নফরকুণ্ডু রোডের কোন্ বাড়ির মেয়েরা আমাদের মত? বেশ করবো, খুব করবো—একশবার আমি ছাদে উঠবো।

এতও রেখা সহ্য ক'রতে পারে। দেখো না একটা সম্বন্ধ সুকুদা রেখার জন্যে। ও আমাদের মত নয়। বাবার মত হ'য়েচে যে-কোন পাত্রে ওকে বিয়ে দেবেন। তুমি দেখো সুকুদা দয়া ক'রে।

সুকুমারের ইচ্ছে করলো, বড়-বাড়ির ঐ বড়কর্তার গলা ধ'রে বাইরের জগতটা দেখিয়ে নিয়ে আসে। এ পছন্দ নয়, ও পছন্দ নয়, এ ঘর খারাপ, ওঘর মন্দ ব'লে এতকাল কুমারী মনের কুসুম-কামনাকে বারবার দলিত, ছিন্ন করা মহাপাপ। এদের নিঃশব্দ হা-হুতাশে সব পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। অতিবড় ঘরন্তী না পায় ঘর।

সুকুমার বললে, রেখা এখন কেমন আছে? তার সঙ্গে দেখা ক'রে গেলে হ'তো।

মৃদুস্বরে মীরা বললে, একেবারে বর নিয়ে এসো। কি আর দেখবে

পিছন ফিরে সুকুমার বললে, আচ্ছা।

সদর বাড়িতে তখন হুলুস্থূল।

পাঁচকড়িমামা আর শঙ্করবাবুতে মহা তর্ক জুড়ে দিয়েছেন।

ইনি বলছেন, তুই চোর; উনি বলছেন, তুই চোর। দু'জনকেই দু'জনে বেরিয়ে যেতে বলছেন। কিন্তু এক পা-ও কেউ নড়ছেন না।

সুকুমারকে দেখে শঙ্করবাবু বললেন, তুমি সিন্ধুর ভাসুরপো, না?

সুকুমার বললে, আজ্ঞে হাঁ।

শঙ্করবাবু বললেন, তা বেশ। আমাকে চেন?

হাঁ। সুকুমার মাথা নাড়লে।

তুমি তো শুনেছিলাম অনেক লেখা পড়া করেচো! শেয়ার বাজারের সব টাকা কি লোকে চোখে দেখতে পায়? জ্ঞাতি শত্রু না হ'লে কেউ শেয়ারে টাকা খাটিয়ে আবার টাকা ফেরৎ চায়! অংশ? আগে ঠিক হোক সেটা কত!

শঙ্করবাবু বললেন।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, ওসব ভাঁওতা কথা ছেড়ে দাও! তোমার নামে আমি ক্রিমিন্যাল স্যুট করবো! শেয়ার দেখিয়ে টাকা বার করবার সময় মনে ছিল না, যথা সময়ে ফেরৎ দিতে হবে! এতদূর অধঃপতন হ'য়েছে, আবার সাফাই গাইচো!

শঙ্করবাবু চটে উঠলেন, বড় টাকার গরম তোমার পাঁচকড়ি! তবু যদি না বাপ ঠাকুর্দা সুদ খাটিয়ে টাকা ক'রে যেত! অধর্মের পয়সা রাখবে কোথায়?

বড় ধর্মের জমিদারি তোমার? কার জমিদারি কে ভোগ ক'রছে! থাকতো সারদাবাবুর কেউ! পাঁচকড়িবাবু টিপ্পনী কাটলেন।

অত পরোয়া করি না! তোর বংশের মত চামার নয়!

শঙ্করবাবু বললেন, পিঁপড়ের গা টিপে টিপে চালাই না! টাকা যতক্ষণ আছে, খরচ করবো!

তাই নিজের শেষ ক'রে পরের খরেচ! নিজে তো গেছোই আবার পাঁচজনকে ডোবাচ্ছ!

বুঝি সুকুমারের উপস্থিতির কথাটা মনে ক'রে সুরটা একটু নরম হয় পাঁচকড়িবাবুর।

সুকুমার অবাক হ'য়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভাঙনের শেষ মুহূর্তে যেন অতর্কিতে সে এসে পড়েছে।

ঠিক এই ধরনের ইতর কলহ দুই বনেদী পরিবারের মধ্যে কোনদিন কোন কারণে ঘটতে পারে সুকুমার কল্পনাও করেনি। শুধু পতন নয়, অধঃপতন!

এককালে সুকুমারের কিশোর মনে এঁরা বুঝি আদর্শ স্থানীয় ছিল—বড়লোক মানে নফরকুণ্ডু রোডের মিত্তির আর ধনী মানে বিহারী ডাক্তার রোডের শঙ্করবাবু!

যদি কোনদিন নিজের পায়ে সে দাঁড়াতে পারে যেন অমন গাড়ি-বাড়ি-লোক-জন-মান-মর্যাদা নিয়েই দাঁড়ায়! অতবড় বাড়ি, অমন প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী সে হবে।

কিন্তু কি ভুল।

কত তুচ্ছ তার চাওয়া।

আজকের সঙ্গে তুলনা ক'রলে, নিজের কাছে নিজেই যেন সুকুমার লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়।

ছি, ছি একদিন এঁরা তাকে আকর্ষণ করেছিল। এঁদের মত ক'রে বড়

হ'তে চেয়েছিল। হায় রে বড়। হায় রে ঐশ্বর্যের ছটা। কালের বিবর্তনে কোন অর্থই থাকে না—বংশ, পদ, বিভব-বৈভব।

সুকুমারের মাতামহ বলতেন—ধন-জন-যৌবন-রূপের অহঙ্কার কাল নিমেষে হরণ ক'রে নেয়।

শঙ্করবাবু বুঝি বুঝতে পেরেছেন সিন্ধুর ভাসুরপোর সামনে এতটা করা ঠিক হয়নি।

আভিজাত্যের শেষ কামড়টুকু তিনি উপলব্ধি করেন।

অস্ত্র ত্যাগ ক'রে বললেন, তা বেশ। টাকা আমি কারো ধারি না। যথা সময়েই তুমি পাবে। আর যদি কখনো আমি আত্মীয় স্বজনের কাছে হাত পাতি তখন আমার নামে থুতু দিয়ো। চাও তো নতুন ক'রে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি? কত সুদ হ'লে তুমি খুশী।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, সুদের দরকার নেই, আসল দিয়ো। হ্যাণ্ডনোট, হ্যাণ্ডনোট করচো—কত হ্যাণ্ডনোট যেন শোধ করচেন। নেহাৎ আত্মীয় সম্পর্ক না হ'লে তোমাকে ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়তুম। বেশী আর বকো না, যাও।

ঘানি ঘোরাবার উল্লেখে শঙ্করবাবু আবার চটে উঠলেন।

মিত্তির বংশের কলঙ্ক তুমি। সুদের কারবার করো লজ্জা করে না? চশমখোর, চামার! কায়স্থের ছেলে বেনের মনোবৃত্তি।

পাঁচকড়িবাবু উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন আবার।

দত্তক! তুমি আর কথা ব'লো না। তবু যদি নিজের মুরোদে কিছু করতে।

বাড়িতে এতবড় একটা বিপর্যয়ের মধ্যে দেনাপাওনার এখন লজ্জাহীন হিসাব নিকাশ আর কোথাও হয়-কিনা সুকুমারের জানা নেই।

হ'লেও তা কোন মতেই বড়-বাড়ির যোগ্য নয়।

আশ্চর্য এঁরা দু'জনেই আজ কটুভাষণে, ছিদ্রান্বেষণে কেউ কারো চেয়ে কম ন'ন।

একদা বিত্তবানদের বিত্তহীনতায় এমন বিকৃত মনোবৃত্তি প্রকট হবে কে

জানতো। এর চেয়ে সামান্য ফুটো পয়সার গরমিলে মাথা ফাটাফাটি, রক্তারক্তি বুঝি ঢের ভাল।

ছি, ছি—নিজেকেই যেন ধিক্কার দিতে ইচ্ছে ক'রলো সুকুমারের।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনাও পাপ।

অথচ হঠাৎ সরে যাওয়াও বিশেষ দৃষ্টিকটু।

এঁদের এই বিবাদের মীমাংসা করবার জন্যেই যেন সে হঠাৎ এসে পড়েছে। এখন সুকুমারের প্রয়োজন সাময়িক। সমস্ত কিছুর সাক্ষী সে! এঁদের বাড়বাড়ন্ত দেখেছে। এদের পতন দেখবে না?

আশ্চর্য, মানুষের ওঠাপড়া। কত অল্প দিনই বা।

সংসারে যদি কোনদিন এই অর্থের প্রয়োজন সৃষ্টি না হ'তো তা হ'লে বুঝি এত অল্পকাল মধ্যে মানুষের উত্থান-পতন ঘটতো না। মানুষের মূল্য-বোধের নিরিখ বুঝি আর কিছুতে স্থির হ'তো!

হয়তো একদিন ঈর্ষা ছিল। হীনমন্যতার দুঃখ ছিল।

আজ কিন্তু সুকুমার দুঃখই পায়—সত্যিকারের করুণা বোধ করে এদের জন্যে!

'ক্যাশবাক্সের' ডালা খুলে জগতটাকে আটকে রেখেছিল—বোঝেওনি সেই জগত কত বড়, কত বিরাট, কত বিচিত্র!

নফরকুণ্ডু কি বিহারী ডাক্তার কোন রাস্তাই আর সেই এতটুকু নেই—কত লোক, কত বিচিত্র ভাবধারা তাদের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে!

পুরোন মিত্তিরদের গাড়ি-ঘোড়া বেরলে আর কেউ বলে না, হাট্‌ যাও! তফাৎ যাও!

ঘড়ার জল গড়িয়ে গড়িয়ে এঁরা আর সরোবরের শোভা দেখলে না। কোম্পানীর সুদের কাগজ ভেঙে ভেঙে বয়েস কাটিয়ে দিলে!

আজ আরম্ভ হ'য়েছে আত্মকলহ!

সকৌতুকে সুকুমার লক্ষ্য ক'রলে, বেশবাস কিন্তু দু'জনেরই সেই এক।

বাহান্ন ইঞ্চি কাঁচি ধুতী, গিলে করা আদ্দির চুড়িদার পাঞ্জাবী, পেটেণ্ট লেদার ঝক্‌ঝকে এলবার্ট ! শঙ্করবাবুর হাতে সিঙ্গাপুরী বেতের লাঠি।

রাগের কথা নয়, শঙ্করবাবু লাঠি ঠুকে বললেন, জমিদারী তুমি নিয়ে নাও—তোমাকেই বেচে দিচ্চি। ওর চেয়ে শেয়ার মার্কেট ঢের ভাল। কেনো বেচ, বেচ আর কেনো।

পাঁচকড়িবাবু চুপ করে রইলেন।

এ আহাম্মকের সঙ্গে কথা কয়ে লাভ নেই। নিজে ডুবেছে আর পাঁচজনকে ডোবাবার মতলবে আছে। না হলে জমিদারী বিক্রী ক'রে দিতে চায়! যার জন্যে এত লপ্‌চপানি—

শঙ্করবাবু বললেন, তুমি ভেব না, তোমার টাকা আমি কড়ায়-গণ্ডায় দিয়ে দেব—বাজারটা একটু স্টেডি হ'তে দাও! স্বাধীনতা পেয়ে মেড়োগুলো সাপের পাঁচ পা দেখেচে! ইংরেজ থাকলে আমাদের মত লোকের এই অবস্থা হয় কখনো? কোথাও কথার ঠিক নেই—আজ এক রকম, কাল এক রকম! ভদ্রলোকের কাল নয় এটা!

সেকথা পাঁচকড়িবাবুও বোঝেন।

দিন-কাল কঠিন হয়ে উঠছে, যেমন চলছিল তেমন আর চলবে না। এই বাড়িই সার!

নফর কুণ্ডু রোডে আজ যাদের প্রাধান্য তাদের কথা কোনকালে কেউ ভাবেনি—চারিদিক থেকে চেপে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দেবার যোগাড়!

হঠাৎ দু'জনের মিল হয়ে যায়।

দুই ভাই হাত ধরাধরি ক'রে উঠান পেরিয়ে বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকে পড়েন।

সুকুমার বুঝতে পারে এবার সত্যিকারের মন দেওয়া-নেওয়া হবে। ছোট্ট ঘরের পর্দাটা গোটান, রামা ঘোরাঘুরি ক'রছে ভেতরে।

খানিক দাঁড়িয়ে থেকে সুকুমার আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসে।

নফর কুণ্ডু রোডে আজকাল গ্যাস বাতির বদলে বিজলী বাতির ব্যবস্থা হয়েছে। তা ছাড়া দোকান-পসরায় তরল আলোর ছটায় মাছি পিছলে যায়। রাতকে দিন!

মীরার হঠাৎ ডেকে পাঠাবার কারণটা যেন বোঝা যায়।

সংসারের অবস্থা দেখে-শুনে হয়তো সে ভয় পেয়েছে—একমাত্র সুকুমারকে ত্রাণকর্তা ভেবেছে!

কিন্তু আশ্চর্য তবু কিছুতে সুকুমার উল্লসিত হতে পারে না।

আজ যেন এ ডাকের কোন মূল্যই নেই। নেহাৎ গরজে পড়েছে তাই তাকে বড়-বাড়ির মেয়েরা ডেকেছে।

প্রয়োজন ছাড়া কানাকড়ি মূল্য নেই সুকুমারের।

সব যখন যায় তখনই মানুষ বাতিল জিনিসের আদর করে।

মীরার কাছে নতুন ক'রে সুকুমারের কোন মূল্য নিরূপিত হয়নি।

যত বড়লোকই সুকুমার হোক, তার যোগ্যতা কোনদিন বড়-বাড়ির তুল্য হবে না।

কি সম্পর্কে এঁদের জন্যে আজ সুকুমারের দুঃখ হবে?

তার লেখাপড়ার ব্যাপারে সামান্য একটু সুবিধে ক'রে দিয়েছিলেন পাঁচকড়িমামা। কিন্তু তার জন্যে এতো? কৃতজ্ঞতার মূল্যে কোন বিপর্যয়কে মানুষ ঠেকিয়ে রাখতে পারে কি?

মানুষকে ওঁরা আপন মর্যাদায় স্বীকার করেনি। বিশ্বনাথের তুলনায় এমন কিছু অযোগ্য সুকুমার ছিল না। আজ যদি—

সত্যিকারের বেদনা যা কিছু ঐ অনূঢ়া, অরক্ষণীয়া মেয়েগুলোর জন্যে।

ওরা একদিন সুকুমারকে সত্যিই ভালবেসেছিল—দাদা ব'লে অকাতরে মিশেছিল। বিয়ে-বিয়ে খেলায় চিলেকোঠার ঘরটা কতদিন মুখর হ'য়ে

উঠেছিল। সেদিন কেউ বোঝেনি এই বিয়ে নিয়ে ঐ কুমারীগুলির মনোবেদনার অন্ত থাকবে না। তাদের যোগ্য পাত্র আর কিছুতে পাঁচকড়িবাবু সন্ধান ক'রতে পারবেন না।

এ হবেই।

করবার কিছু নেই সুকুমারের।

বড়-ছোটর ভেদ উঠে যাচ্ছে, এখনো যদি না বোঝেন ওঁরা কার ক'রবার কী আছে!

রাস্তার মোড়ে এসে কেমন যেন ভয় হয় সুকুমারের।

কোনদিন মেয়েগুলো সাংঘাতিক কিছু যদি ক'রে বসে? সে আঘাতের ঘা-টা যেন সুকুমারকেই বাজবে বেশী ক'রে। পাঁচকড়িমামার কি, তার তো হ'য়ে এসেছে!

নিজের বোনেদের সুকুমার বিয়ে দিয়েছে।

তারা সুখেই আছে।

খাওয়া-পরার অভাবে কেউ মরেও যায়নি।

চেষ্টা ক'রলে হয়তো সুকুমার এদেরও উপযুক্ত ঘরে পার ক'রতে পারে। কিন্তু পাঁচকড়িমামা কি পছন্দ করবেন, রাজী হবেন? সেদিন নেশার ঝোঁকে যা বলেছেন কার্যকালে তা হয়তো অস্বীকার করবেন।

কত দরের লোক সুকুমার!

"এবার যখন আসবে একটা পাত্র সঙ্গে ক'রে এনো সুকুদা রেখার জন্যে!"

কথাটার মর্মান্তিকতা কানে এখনও বাজছে।

সবার জন্যেই পাত্র চাই, আর এক তিলও দেরি নয়!

কিন্তু কিরূপ পাত্র চাই এই সব বিগত-যৌবনা মেয়েদের জন্যে?

কোন্ সে হৃদয়বান যে এদের দুঃখের যথোপযুক্ত মর্যাদা দেবে?

একান্তই যখন সুকুমারকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহে রাজী করান গেল না, তখন বিহারীবাবু ছোট ছেলে সুবোধের জন্যে পাত্রীর সন্ধান ক'রতে লাগলেন। সুকুমারের অবস্থা অনুযায়ী পাত্রীপক্ষ অনেকেই অনুগৃহীত হ'তে চাইলেন। মেয়ে দেখা-শোনা চলতে লাগল।

প্রায় রোজই বাড়ি ফিরে সুকুমার বাপের মুখে নতুন নতুন পাত্রীর বিবরণ শোনে।

আবার রোজই কাজে বেরোবার সময় সেগুলিকে অমনোনীত ক'রে যায়।

নতুনতর সন্ধানের জন্যে বলে।

শেষটা বিহারীবাবু বড়ছেলের মতিগতি দেখে বললেন, তোর মতলব কি বল দিকি, সুবোধের বিয়ে দিবি না? যেভাবে বাছতে আরম্ভ করেছিস তাতে মেয়ে পাওয়া দুষ্কর! তোরা আজকাল হলি কি?

সুকুমার বলে, তা বলে যা-তা একটা ধরে দিলে তো হবে না!

বিহারীবাবু বলেন, যা-তা মানে। এতগুলো সম্বন্ধ সব যা-তা! সেদিন চন্দ্রবাবু যে সম্বন্ধটা আনলেন সেটা খারাপ কিসে? কত বড় বংশ, আজ না হয় অবস্থাটা কিছু হীন হয়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার বলে, ও বংশ-ফংশ দিয়ে চলবে না। আমাদের ছেলের বিয়ে আমরা দেখে নেব। দস্তুর মত ওজন ক'রে নেব। বনেদী বড়লোক ঢের দেখা আছে!

বিহারীবাবু ছেলের কথা শুনে অবাক হ'য়ে যান।

সুকুমার এসব বলছে কি! সুকুমার তো এমন ছিল না।

বিহারীবাবু বলেন, তা হ'লে কি চাও? বংশ দেখবে না, ঘর দেখবে না, কি চাও?

ভায়ের জন্য সুকুমার কি চায় নিজেই হয়তো জানে না স্পষ্ট ক'রে।

কিন্তু যা পাচ্ছে তা-ও যেন তার চাওয়ার অনেক কম।

শুধু নিজের পায়ে দাঁড়ান নয়, বাড়ি-ঘর, বিষয়-আশয় বেশ কিছু করেছে সে। বহুলোকের অন্নের সংস্থান হচ্ছে তার কারবারে খেটে।

যে বংশের যত গৌরবই থাক, বর্তমান সুকুমারের তুলনায় তা কিছু নয়। সুতরাং দেখেশুনে ভায়ের জন্যে মেয়ে আনতে হবে। এক কথায় রাজী হ'য়ে পরে পস্তাতে সে চায় না।

তা ছাড়া কেমন যেন একটা মজা আছে এই পাত্রী মনোনয়ন ব্যাপারে। কিছুতে তার লোভ সামলান যায় না। ঘুরুক না মেয়ের আত্মীয়-স্বজন বরের আত্মীয়ের চারপাশে।

দেখে-শুনে 'না' ক'রতে যেন নেশা লাগে।

বিহারীবাবু হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

আজকালকার ছেলেদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হবে না।

তাঁদের কাল চলে গেছে।

সুকুমার যা ভাল বোঝে করুক।

নিজেও ক'টা মেয়ে দেখলে সুকুমার।

আশ্চর্য, কোনটাই তার পছন্দ হ'লো না। বাংলা দেশে পছন্দ করবার মত মেয়েই নেই।

সে কি করবে।

সুতরাং সুবোধের বিয়েটা মুলতুবী থাকে।

লক্ষ কথার এখনো অনেক বাকি।

কি যে মানুষের খেয়াল, কি যে তার মনোগত ইচ্ছা, কিছু বোঝা যায় না।

অন্তত সুকুমারের রকম দেখে তাই মনে হয়।

তার নিজের কথাটা না হয় স্বতন্ত্র, কিন্তু ভাইয়ের বিয়ের অভিভাবকত্ব করতে গিয়ে এমন করাটা কোন যুক্তির মধ্যেই পড়ে না।

কেন সে এমন তানা-না-না ক'রছে?

একদিন সুকুমার নিজের আপিস ঘরে বসে খাতাপত্র দেখছিল।

হঠাৎ বাইরের দিকে নজর পড়তে মনে হ'লো, ডালহৌসী স্কোয়ারের চেহারাটা কেমন যেন বদলে গেছে। নির্লিপ্ত ঔদাসিন্যের ভাবটা কখন কেটে গেছে। অদ্ভুত একটা সফল সম্ভাবনায় দৃষ্টিটা আবেশপূর্ণ যেন। অতীতের সে ঘোলাটে পঙ্কিল দৃষ্টি নেই।

নিজের মনটাকে বুঝি সুকুমার প্রত্যক্ষ ক'রতে পারে।

কেমন একটা শূন্যতা উপলব্ধি করে। কিছুই তার নেই। আর যা আছে, তা না থাকলেও কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না কারো। নিজেকে যেন বৃথাই প্রবোধ দিয়ে এসেছে সে।

সুকুমার যদি সেই সুকুমার থাকতো ?

'মানুষ হবার' প্রাণান্ত পরিশ্রমে যদি নিজেকে তার গড়ে-পিঠে না নিতে হ'তো। কি ক্ষতি ছিল ?

হঠাৎ সুকুমারের কানে গেল, তার ঘরের দরজার বাইরে কে যেন তারই নাম ক'রে খুঁজছে—এটা সুকুমার বোসের আপিস তো ?

গলার স্বরে কিছু বোঝা গেল না।

সুকুমার বেল টেপবার আগেই ভদ্রলোক নিজেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন।

খানিক সুকুমারের মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না।

আশ্চর্য, এ পাড়ায় এমনি ভাবে খোঁজ ক'রে শঙ্করবাবু যে কোনদিন তাঁর আপিসে আসতে পারেন সুকুমার ভাবতে পারেনি।

সুকুমার যথোচিত অভ্যর্থনা ক'রে বললে, আসুন। আসুন।

শঙ্করবাবু চারিদিক লক্ষ্য ক'রে বললেন, তা বেশ। বেশ আপিস করেচো।

সুকুমার কুণ্ঠিত বোধ করলে।

কাঁধের ওপর থেকে কোঁচান উড়ানিটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে শঙ্কর-বাবু বললেন, খুব খুশী হ'য়েচি তোমার উন্নতি দেখে। তুমি সিন্ধুর ভাসুর পো। ধরতে গেলে আমাদের আপনারই জন। সিন্ধুকে আমি এইটুকু দেখেচি।

সুকুমার মাথা নাড়লে।

শঙ্করবাবু বললেন, তা বেশ। এককালে তোমরাও কম ছিলে না—সিন্ধুর বিয়ের সময় কম ঘটা হ'য়েছিল! সে তুলনায় পাঁচকড়িরা কিছু না। দুটো ধানের কল, একটা তেলের কল দিয়ে তোমাদের সঙ্গে টেক্কা দেবে, আরে রামঃ। রসুলপুরের বোসেরা কম ডাকসাইটে নয়। কালেক্টারীতে এককালে তোমাদের কর্তারা কত খাজনা দিতো জান?

সুকুমার মাথা নাড়লে, না।

তুমি জানবে কি ক'রে? তোমরা যখন হয়েচো তখন সব ফক্কা। বিশ বছর পার্টিশানের মকদ্দমা ক'রে শরিকে শরিকে শেষ। জমিদারী ঝাঁঝরা।

হাতের লাঠিটা শঙ্করবাবু ঠুকলেন।

কম বড় জমিদারী ছিল নাকি রসুলপুরের বোসেদের?

পূর্ব গৌরবে সুকুমার হয়তো কিছু গর্ব বোধ করে।

আশ্চর্য, তার চেয়ে ইনি বেশী জানেন তাদের সম্বন্ধে।

উড়ানিটা গলায় তুলে শঙ্করবাবু বললেন, এই যে তুমি এত রোজগার করচো এটা খুব সুখের কথা। কিন্তু দেখবে পূর্বপুরুষদের নাম যেন বজায় থাকে সব সময়। যতই রোজগার কর, দেখতে হবে বংশের মানটা কদ্দূর বাড়লো।

সুকুমার স্বীকার করলে।

বংশমর্যাদাটাই আসল।

রোজগার যে-সে ক'রতে পারে।

শঙ্করবাবু বললেন, জমিদারী বাড়াও কেবল—দেখবে তোমার মান-মর্যাদাও বেড়ে গেছে সেই সঙ্গে।

সুকুমার চুপ করে রইল।

ঠিক বুঝতে পারছে না, শঙ্করবাবু কি উদ্দেশ্যে আজ উপযাচক হ'য়ে এমন উপদেশ দিচ্ছেন।

নিজের জমিদারী তো লাটে উঠেছে।

শঙ্করবাবু হাসলেন, আমার কথা তুমি ব'লবে ? এখনো যা আছে, তার দামই কে দেয়। যুদ্ধের বাজারে অনেক তো বড়লোক হ'য়েচে শুনতে পাই—কই, করুক দেখি একটা জমিদারী।

সুকুমার পান আনালে, সিগারেট আনালে।

সিগারেট ধরিয়ে শঙ্করবাবু বললেন, সিন্ধুর ভাসুর পো তুমি। আমাদের ঘরের লোকের মত, তোমার কাছে কোন কিছু গোপন করা উচিত নয়। কি বল ?

সুকুমার মাথা নাড়লে।

বেতের লাঠির ওপর ভর দিয়ে শঙ্করবাবু বললেন, এ্যাটর্নির বাড়ি থেকে আসছি। জানি তো সব কোথায় কি হচ্ছে।···সব খবরই পাই।···শঙ্কর মিত্তিরের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়—কোলকাতার ক'টা বনেদী বড়লোক আছে জানতে আর বাকি নেই। এই আঙুলের ডগায়।

সুকুমার ভেবে পায় না, সে-খবরে তার উপস্থিত প্রয়োজন কি।

শঙ্করবাবু কেন মিথ্যে মাথা ঘামাচ্ছেন।

শঙ্করবাবু বললেন, তোমাকে ছোটবেলা থেকে জানি। সিন্ধুর ভাসুর পো তুমি।···তোমাকে সাবধান ক'রে দেওয়া উচিত—

সুকুমার বললে, বলুন, কি বলবেন ?

বলবার কিছু নেই।

কণ্ঠটা শঙ্করবাবু হঠাৎ নির্লিপ্ত ক'রলেন, ঘরের কথা না বলাই ভাল।

সুকুমার চুপ ক'রে থাকে।

আচ্ছা মুশকিলে ফেলেছেন ভদ্রলোক।

মুখ ফুটে বলাও যায় না কিছু।

শঙ্করবাবু বললেন, তুমি সিন্ধুর ভাসুর পো। তাই তোমাকে সাবধান ক'রে দেওয়া—পাঁচকড়ির ওখানে যাতায়াত বেশী করো না—মেয়েগুলো ওর ভাল নয়।

বিমূঢ় সুকুমার স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

হঠাৎ এভাবে শঙ্করবাবু তাকে উপযাচক হ'য়ে সাবধান ক'রতে আসেন কোন্ সাহসে। কোন সম্পর্কই নেই তার ভদ্রলোকের সঙ্গে।

উঠতে উঠতে শঙ্করবাবু বললেন, ঐ বাড়িটা পাঁচকড়ি এক মেড়োর কাছে বাঁধা দিয়েচে···যা ছিল সব পেটে পুরেচে। অধর্মের টাকা কখনো থাকে? মক্ষিচোষ্।

আর বুঝি সুকুমার নিজেকে সামলাতে পারে না।

স্বরটা একটু রূঢ়ই শোনায়ঃ আমার কাজ আছে, আপনি আসুন এবার—

শঙ্করবাবু দোর গোড়ায় এগিয়ে গিয়ে বললেন, তা বেশ। তুমি সিন্ধুর ভাসুর পো। ঘরের লোক, তাই বলচি। দেখে নিও ওবাড়ি আর পাঁচকড়িকে কোনকালে ছাড়াতে হবে না—মেড়োর খপ্পরে যখন একবার গেচে। ঢের দেখা আছে আমার—কোলকাতার 'এইটি পারসেন্ট' বিষয়সম্পত্তি এখন ওদের কবলে।

কর্কশ কণ্ঠে সুকুমার জিজ্ঞেস ক'রলে, আপনারটা কার কাছে?

ঘুরে দাঁড়িয়ে শঙ্করবাবু হাসলেন, সে বিষয়ে ওরা ভারি চালাক, জমিদারী ওরা কিনতে চায় না—ফিপ্‌টি পারসেন্ট লেস্ করতে চেয়েচি। খদ্দের একটা করে দিতে পার বাবাজী?

এ হেন একজন বেহায়াকে শিক্ষা দেবার জন্যে সুকুমার বললে, আসবেন এক সময় কাগজপত্তর নিয়ে; আমিই নেব।

তারপর 'সেল ডিড' সম্পূর্ণ হতে প্রায় মাসখানেক লাগল।

আধা-কড়িতে শঙ্করবাবু জমিদারী বিক্রি ক'রে দিলেন। এখনো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার মুনাফা। বাড়িটা শঙ্করবাবু বিক্রি কবলায় লেখালেন না। কোট কবলা করলেন। তাঁর বিশ্বাস, বাড়িটা তাঁকে এখনো কিছু দিয়ে যাবে। ফটকা বাজারে ওর মূল্য কম নয়।

ঘুরিয়ে কথাটা সুকুমার তুলেছিল।

শঙ্করবাবু এড়িয়ে গেলেন।

ডুবতে গিয়ে কুটি আঁকড়ানর মত বাড়িটা ধরে রাখলেন।

ওতেই একদিন তুরূপ ঝাড়বেন। জমিদারী যায় যাক। বেঁচে থাকলে অনেক জমিদারী ক'রতে পারবেন।

কিন্তু সুকুমার জানে ও-বাড়ি শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে—বিক্রি কবলা কার সিন্দুকে একদিন বন্দী হবে।

বিহারী ডাক্তার রোডের ঐ বাড়ি ভেঙেচুরে নতুন ক'রে তৈরী হবে।

রাস্তার নাম না বদলালেও বাড়িটার অনেক রদবদল হবে। নতুন মালিক শখ ক'রতে বাড়ি কিনবেন না।

এককালে এই দুটো বাড়ি সুকুমারের বিস্ময়ের স্থল ছিল। নফর কুণ্ডু রোড থেকে বিহারী ডাক্তার রোড-এ আসতে গেলে তখনো কটা খানা-ডোবা যেন পেরোতে হ'তো, রাস্তাঘাট তখনো পিচ ঢালা হয়নি, গ্যাসের আলো জ্বলতে জ্বলতে নিভে যেত।

বিনা নম্বরে লোকে ও দুটো বাড়িকে চিনতো—জমিদার বাড়ি, আর পুরোন মিত্তির বাড়ি।

আজো হয়তো কেউ কেউ চেনে, আর ক'দিন পরে কেউ চিনবে না, নম্বরের তলায় সব আভিজাত্য ডুবে যাবে, হারিয়ে যাবে সব পরিচয়।

এ-পাড়া ও-পাড়ার কোন নবাগতই খোঁজ রাখবে না।

সুকুমার কিনলেও তাই করতো।

সম্পত্তি, সম্পত্তি।

তার আবার লোক দেখান আড়ম্বর কি? তিন মহল ভেঙে তিপ্পান্ন মহল ক'রলে বাড়ির দাম অনেক আগেই উঠে আসবে।

ওসব আজকাল আর চলে না। চললে, ওদের অবস্থা অমন হ'তো না। এ একটা আশ্চর্য বিধান—তুমি গড় আর আমি ভাঙি; আমি গড়ি তুমি ভাঙ।

ভাঙা-গড়ায় কি যে হচ্ছে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। পুরোন গল্পের মত অতীতটা অবিশ্বাস্য।

জমিদারী বন্দক-বিক্রি ক'রে খুব দুঃখ পেয়েছেন বলে মনে হ'লো না শঙ্করবাবুকে।

যেন টাকাগুলো তাঁর বাড়তি লাভ হ'লো।

শঙ্করবাবু বললেন, কেনা-বেচাটাই হ'লো আসল সম্বন্ধ। তুমি কিনচো, আমি বেচচি। আর আমি কিনচি, তুমি বেচচো। বাবা এ সম্পত্তি কিনেছিলেন ঘোড়াঘাটার চৌধুরীদের কাছ থেকে; চৌধুরীরা কিনেছিলেন মুড়োগাছার রায়েদের কাছ থেকে—আরো যদি খোঁজ নাও দেখবে, তাঁরাও কিনেছিলেন আর কারো কাছ থেকে—কেনা-বেচা ক'রতে ক'রতে এসে পড়ল তোমার হাতে। একেই বলে প্রকৃত হস্তান্তর।

খুব খাওয়ালেন শঙ্করবাবু।

যাকে বলে ভোজ।

আত্মীয়-বন্ধু যে যেখানে ছিল নিমন্ত্রিত হ'য়েছিল।

কেবল পাঁচকড়িবাবু আসেন নি, হয়তো নিমন্ত্রিত হননি।

সুকুমারের আত্মীয় বলে তাদের বাদ দেওয়া হ'য়েছিল।

বাহান্ন ইঞ্চি কাঁচি ধুতীর কোঁচান কোঁচাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, আদ্দির মেরজাই ঘামে অল্প অল্প ভিজে গেছে, পেটেণ্ট লেদারের চটিটার মুখটা চকচক্ ক'রছে—গেট পর্যন্ত শঙ্করবাবু সুকুমারকে এগিয়ে দিলেন।

বললেন, আমরা হলুম লাল কালির দলে, মহামহিম, শ্রীযুক্ত শ্রীল···

হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন শঙ্করবাবু।

গাড়িতে উঠে সুকুমারের মনে হ'লো, খুব ঠকিয়েচেন তাকে শঙ্করপ্রসাদ মিত্র। মিথ্যে মিথ্যে কতকগুলো টাকা 'ব্লক' ক'রে রাখলে সে। একেবারে ব্যাড ইনভেস্টমেণ্ট।

সম্পত্তিলাভের এত বড় সংবাদটা সিন্ধুবাসিনীকে দেওয়া উচিত কিনা ভেবে ঠিক ক'রতে পারলে না সুকুমার।

না, থাক।

বড় বেশী জাহির করা হবে নিজেকে।

তবু ক'দিন কি ভেবে নিজের গাড়িটা নিয়ে সুকুমার নফর কুণ্ডু রোডের ওপর দিয়ে যাওয়া-আসা ক'রলে।

পাঁচকড়িমামার বাড়ির সামনে এসে অনেকবার নামবার ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু অদ্ভুত এক লজ্জায় নামতে পারেনি কিছুতে।

এখন বাড়িটাকে তেমন বিশেষ ক'রে চেনাও যায় না—আশেপাশে অনেক বাড়ির ভিড়।

পুরোন সেকেলে বাড়িটা যেন হারিয়ে গেছে।

একদিন সুকুমারের মনে হ'লো, বাড়িটা সত্যিই এ রাস্তায় নয়—ভুল রাস্তায় সে গাড়ি ঢুকিয়েছে।

না, এই তো নফর কুণ্ডু রোড।

তা হ'লে?

আবার গাড়িটা পিছিয়ে নিয়ে এল—এক এক ক'রে রাস্তার দু'পাশে বাড়িগুলো নজর ক'রলে।

না, ঐ তো বাড়ি—সামনেটা সংস্কার করা হচ্ছে, বাঁশের ভারা বাঁধা র'য়েছে আষ্টেপৃষ্ঠে। বড় বড় থামগুলো ঠুকরে ঠুকরে খুবলে ফেলা হয়েছে।

নফর কুণ্ডু রোডের নব রূপায়নের সঙ্গে মিল থাকা চাই বাড়িটার।

সেদিন নামা হ'লো না, তারপরেও না।

সুকুমারের কেমন যেন ধারণা হলো ও-বাড়িতে পূর্বের বাসিন্দারা কেউ নেই।

তিন মহলের কোন মহলেই কেউ নেই।

ঝোঁকের মাথায় শঙ্করবাবুর ঐ ফুটো সম্পত্তি না কিনে পাঁচকড়ি মামার বাড়িটা কিনলে কেমন হ'তো? তবু তো ওরা নিরাশ্রয় হ'তেন না।

পাঁচকড়ি মামা কিছু মনে করতেন? তা করুন।

সিন্ধুবাসিনীকে বুঝিয়ে ঠিক করা যেত। কারো জন্যে না হোক নিজের মেজোকাকীর জন্যে সুকুমার এটুকু ক'রতে পারতো ইচ্ছে করলে। খবর পেয়ে তার একবার আসা উচিত ছিল।

যদি ওরা থাকেনও এখন কোন্ মুখে গিয়ে ওদের সামনে সুকুমার দাঁড়াবে? লজ্জা ক'রবে না? অকৃতজ্ঞ, নির্লজ্জ মনে হবে না নিজেকে?

অনেকটা ভয়ে ভয়ে ক'দিন সুকুমার নফর কুণ্ডু রোড দিয়ে যাওয়া-আসা ক'রলে না।

সত্যিই যদি কোন নতুন বাসিন্দা ওখানে এসে পড়ে। দরকার কি অনভিপ্রেত সে-দর্শনে।

পুরোন মিত্তির বাড়িটা স্মৃতি হয়ে থাক।

কি একটা বিরাট শোভাযাত্রার জন্যে সেদিন সদর রাস্তায় সব গাড়ি-ঘোড়াগুলোকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

সুকুমারের গাড়িটাও ঘুরলো।

আশ্চর্য সেই নফর কুণ্ডু রোড দিয়ে ঢুকে একবারও তার রাস্তাটার কথা মনে হ'লো না।

রাস্তা তো রাস্তা। পিচ-ঢালা সর্পিল।

কোন্ রাস্তা কে জানে।

খানিকটা এসে সুকুমার প্রাণপণ শক্তিতে ছুটন্ত গাড়িটার ব্রেক কষলে।

সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ একটা আর্তনাদের শব্দে নফরকুণ্ডু রোড চমকে উঠলো। চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে এল—কোন দুর্ঘটনা ঘটলো নাকি।

গাড়িবারান্দায় উঁকিঝুঁকি।

গাড়ি থেকে সুকুমার নেমে পড়ল।

ভিড় ঠেলে ধীর পায়ে পাঁচকড়িবাবুর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সত্যিই ওঁরা বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন।

বাড়ির সামনে ক'টা লরী মাল বোঝাই হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে পাঁচকড়িমামা কি যেন নির্দেশ দিচ্ছেন ড্রাইভারকে।

লরীর পিছনে দুখানা ট্যাক্সি অপেক্ষা ক'রছে।

মাল চলে গেলে মানুষ যাবে।

সুকুমার চোখ তুলে চাইতে বুকের ভেতর থেকে একটা কান্না যেন ঠেলে এল।

এতটা সে আশা করেনি।

মিত্তির বাড়ির অন্তঃপুরিকারা এই প্রথম সদর রাস্তার ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন।

নিরঞ্জনের সময় সর্বজনীন পূজার প্রতিমাগুলিকে এমনি ক'রে বুঝি পূজা মণ্ডপ থেকে বাইরে এনে রাখা হয়।

তারপর এক এক করে লরীতে তুলে নরলোকের চোখের ওপর দিয়ে শোভাযাত্রা করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

সুকুমার চোখ নামিয়ে নিলে।

এ দৃশ্য সে দেখতে পারবে না কিছুতে।

কালের বিধান যাই হোক, এ বিধান সে সহ্য ক'রতে পারে না।

কাছে এসে সুকুমার পাঁচকড়িবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রলে।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, সুকুমার; ভালই হ'লো যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল—

সুকুমার চোখ তুলে চাইতে পারলে না।

লজ্জা নয়, অকারণে কেমন যেন তার নিজেকে বড় অপরাধী মনে হ'লো।

লরী ছাড়তে ট্যাক্সি দুটো এগিয়ে দরজার সামনে এল।

মিত্তির বাড়ির অন্তঃপুরিকারা একসঙ্গে নড়ে উঠলো।

সিন্ধুবাসিনী আগে, পিছনে লীলাবতী, সুধা, মীরা, রেখা, রেবা, শিপ্রা, শান্তা পর পর।

হাফপ্যান্ট পরা পাঁচকড়িমামার একমাত্র বংশধর বীরেশ্বর কাকাতুয়ার দাঁড়টা হাতে ক'রে এক পাশে দাঁড়িয়ে।

পাঁচকড়িমামা নির্দেশ দিলেন।

মিত্তির বাড়ির মেয়েরা জড়াজড়ি ক'রে এগিয়ে এলেন পুরোন বাড়িটার মায়া ত্যাগ ক'রে।

পাঁচকড়িমামা বললেন, বাড়িটা এক মেড়োকে বেচে দিলুম। এত বড় বাড়ি পোষাও যা, হাতি পোষাও তা। পাঁচগুণ ট্যাক্স বাড়িয়েচে ব্যাটারা। তিনবার ক'রে ভ্যালুয়েশন করেচে। আবার নাকি ট্যাক্স বাড়াবে।

সুকুমারের বলবার কিছু নেই।

কত স্মৃতিই এমনি ক'রে ট্যাক্সের দায়ে হৃদয় থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে।

পাঁচকড়িমামা বললেন, আরো কিছু দিন থাকা যেত, কিন্তু যেভাবে মিস্ত্রী লাগিয়েছে আর থাকা গেল না। আব্রু থাকে না। ওর চেয়ে মানে মানে চলে যাওয়াই ভাল। কথা ছিল—

কি একটা জিজ্ঞেস ক'রবে ভেবে সুকুমার থেমে গেল।

জিজ্ঞাসা করবার কিছু নেইও।

পিছনের দলটির অযথা দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ট্যাক্সির মিটার ডাউন করা আছে।

সেদিন পাড়ার গণ্যমান্য সুরেশবাবুকে অপমান করা নিয়ে যে দলটি পাঁচকড়িমামার বাড়ি চড়াও হ'য়েছিল তাদের কয়েকজনকে যেন সুকুমার চিনতে পারলে। রাস্তার ও-ফুটপাথে তারা জটলা ক'রছে। কি একটা মতলব আছে ওদের।

সুকুমার মেয়েদের আড়াল ক'রে দাঁড়াল।

ঐ নির্লজ্জ দৃষ্টিগুলোকে সে প্রতিহত ক'রতে চায়।

ওরা এখানে কেন?

মজা দেখছে?

পাঁচকড়িবাবু তাড়া দিলেন, আঃ, মুশকিল। দাঁড়ালে কেন সব? চলে এস—কৈ রে সিন্ধু?

ইতস্তত করে সুকুমার জিজ্ঞেস ক'রলে, আপনারা সবাই যাচ্চেন?

এত দুঃখেও কৌতুক ক'রে পাঁচকড়িবাবু বললেন, সবাই না তো অর্ধেক? থাকবে কে? ভেকাণ্ট পসেশন দিতে হবে না?

সুকুমার সহজ কণ্ঠে বললে, না, যদি কিছু মনে না করেন, রেখাকে রেখে যান।

কোথায়? তেমনি কৌতুক করলেন পাঁচকড়িবাবু।

আমাদের ওখানে।

সুকুমারের আজ হ'লো কি, আবোল তাবোল বকছে।

মিত্তির বাড়ির মেয়েরদল ফুটের মাঝপথে থেমে গেল।

পাঁচকড়িবাবু বললেন, বেশ, নিয়ে যাও।

সুকুমার বুঝি আর মুখ তুলে চাইতে পারছে না।

এক এক ক'রে সবাই গাড়িতে উঠলো।

অবনতমুখী রেখা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মীরা তখনো গাড়িতে ওঠেনি। সবার ওঠার সাহায্য করছে।

মাথা নীচু ক'রে সবার শেষে গাড়িতে উঠতে যেতে সুকুমার পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি কোথায় যাচ্ছ? নেমে এস। বড়মামা, মীরাও থাক।

যে পারে থাক। আরে, গাড়ি চালাও না। পাঁচকড়িবাবু বোধ হয় বিরক্তই হ'য়েছেন।

রাস্তার মাঝখানে কি হচ্ছে!

ক্রমে ঐশ্বর্যশালিনী নফরকুণ্ডু রোড নীরব হ'য়ে এল।

আর কোন গোলমাল নেই, ভিড় নেই, গাড়িঘোড়ার শব্দ নেই।

বড় রাস্তার শোভাযাত্রা অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে।

খানিক পরে রাস্তাটা আবার উচ্চকিত হ'য়ে উঠলো।

দূর থেকে একটা প্রাইভেট ঘোড়ার গাড়ি ঝড়্ঝড়্ ক'রতে ক'রতে এগিয়ে এল।

কী শব্দ অশ্বশকটের!

পুরোন মিত্তির বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামলো।

যেমন চেহারা গাড়ির, তেমন মূর্তি ঘোড়ার।

বহুকাল রঙ পড়েনি গাড়ির গায়ে, দানা পড়েনি ঘোড়ার পেটে।

তবু একটা মায়ায় যেন উভয়ে উভয়ের কাছে বাঁধা পড়েছে।

গাড়ি থেকে শঙ্করবাবু নামলেন।

কোঁচাটা বাগিয়ে ধরে পাঁচকড়িবাবুর বাড়ির ভেতর চলে গেলেন।

ঘড়ি-ধরা সাড়ে সাত মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন।

তারপর গাড়িতে উঠে কোচম্যানকে গাড়ি ছাড়তে ব'লে নফরকুণ্ডু রোডকে শুনিয়েই যেন শঙ্করবাবু বললেন, যাও, আমিও যাচ্ছি পিছন পিছন। সেল ডিড্ কম্‌প্লিট্।